সোনালী রেখা

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

BENGALI EBOOK
2021

সূচিপত্র

সুলক্ষণা 2
সোনালী রেখা 48

সুলক্ষণা

পাঠক ধরে নেবেন না একটা গল্প লেখার তাগিদে বাইশ বছর বাদে শেষে হরির দুয়ারে এসে তার সঙ্গে হঠাৎ এভাবে দেখা হয়ে গেল। হরির দুয়ার বলতে হরিদ্বার। আর তার সঙ্গে মানে সুলক্ষণা দয়ালের সঙ্গে। খবরটা আমাকে দিয়েছিল ছেলেবেলার বন্ধু জয়ন্ত রঙ্গ। নতুন বয়সের কালে কোনো রাজনীতির দলে ভিড়েছিলাম। হালকা গোছের ব্যাপার সেটা। তবু উৎসাহ আর উদ্দীপনা কম ছিল না। জায়গাটা এলাহাবাদ। সর্ব ব্যাপারেই বেশ নিরাপদ গোছের পটভূমি। শাসক দলের সব কাজে প্রতিবাদের ঝড় তুললেও গর্দান যাবার ভয় ছিল না। এমন কি হাজত বাসের ঝুঁকিও যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলতাম। বেকার জীবনের স্বল্পমেয়াদী শৌখিন রাজনীতির অধ্যায় বললে যতটুকু বোঝায়। যুক্তির থেকে তর্কের ঝোঁক বেশি ছিল। শোনার থেকে শোনানোর।

জয়ন্ত রঙ্গ সেই সময়ের আর সেই দলের অন্তরঙ্গ একজন। পেশার ক্ষেত্রে এখনো সতীর্থই বলা চলে তাকে। ইউ. পি-র এক নামী কাগজের হোমরাচোমরা সাংবাদিক। বছরে দু-একবার কলকাতায় আসে। তখন দেখা হয়। মন-খোলা গল্পও হয়। গেল মাসে এসেছিল। খবরের কাগজের মানুষ। প্রথমেই জোরদার খবর দেবার মতো করে বলল, মাঝে দিন কয়েকের জন্য হরদোয়ার বেড়াতে গেছলাম, সেখানে হর কী পিয়ারার ঘাটে হঠাৎ তোমার সুলক্ষণার সঙ্গে দেখা

কার কথা বলছে বা কি বলছে ভেবে না পেয়ে আমি অবাক একটু।আমার সুলক্ষণা। সে আবার কে?

চোখ পিটপিট করে জয়ন্ত বলল, ক্যা তাজ্জব কি বা–এলাহাবাদের সেই সুলক্ষণা দয়াল-কৃষ্ণকুমারের বোন-ভুলে গেলে? তোমার সেই ঝুমরি।

শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমার মগজের মধ্যে একটা ওলটপালট কাণ্ড শুরু হয়ে গেল। যার ফলে তখনো বোধ হয় হাঁ করে চেয়েই ছিলাম ওর দিকে। এবারে হালছাড়া গলায় চোস্ত উর্দুতে জয়ন্ত রঙ্গ রসিকতা করে উঠল, কি

www.bengaliebook.com

রকম রসের কারবারী তুমি, যে মেয়ের মন পাবার জন্য আমাকে কাটতি দিয়ে গায়ে আতর মেখে দু বেলা কৃষ্ণকুমারের বাড়ি পলিটিক্স কপচাতে যেতে, আর হঠাৎ নিপাত্তা হয়ে যেতে যার। খোঁজে তামাম এলাহাবাদ চষে বেড়িয়ে শেষে আমার গলা চেপে ধরলে–সেই পহেলী চিড়িয়াকে বেমালুম ভুলে মেরে দিলে।

ভুলিনি। বিস্মরণের পলস্তরা পড়ে ছিল। শোনার সঙ্গে সঙ্গে বাইশ বছরের একটা ভারী পর্দা চোখের সামনে থেকে সরে গেছে। এক বাড়ির মেয়ে পুরুষ ছেলে বুড়ো সক্কলের গায়ের চামড়া চোখে লাগার মতো ধপধপে ফর্সা। সকলের মধ্যে ব্যতিক্রম শুধু উনিশ-কুড়ি বছরের একটি মেয়ে। যার গায়ের রঙ ফর্সা নয়। তা বলে কালোও ঠিক নয়। কিন্তু বাড়ির লোকের পাশে কালোই দেখাতো। বাড়ির মানুষেরা তার গায়ের রং নিয়ে খুঁতখুঁত করত। কিন্তু সেই মেয়ের আয়তপক্ষ্ম নিবিড় কালো চোখের তারায় আমি যে আলো ঠিকরোতে দেখেছি, আর তার সুচারু দুই ঠোঁটের ফাঁকে যে অধরা হাসির ঝিলিক দেখেছি, এই খুঁতখুঁতুনির কথা শুনলে বাড়ির মানুষগুলোকে আমার অন্ধ মনে হত। কৃষ্ণকুমার অবশ্য বলত, ঝুমরির গায়ের রং একটু চাপা হলেও অমন রূপ কটা মেয়ের হয়। এরা সব মিথ্যে ভাবে, ওর খুব ভালো বিয়ে হবে আমি বলে দিলাম।

ঝুমরি বা সুলক্ষণা কৃষ্ণকুমারের মামাতো বোন। এ-বাড়ির সমাদরের আশ্রিতা। বছর দুই আগে কলেজে পড়ার নাম করে বাপের বাড়ির সংস্রব ছেড়ে এলাহাবাদে পিসির কাছে চলে এসেছিল। কলেজে পড়ছিলও। কিন্তু পড়াশুনায় তেমন মতি আছে। আমার মতো নীরব ভক্তও সে-কথা বলবে না। কৃষ্ণকুমার বলত, ঝুমরির মাথা খুব, একটু পড়লেই ভাল রেজাল্ট করতে পারে, কিন্তু পড়তে ডাকলেই ওর গায়ে জ্বর আসে

যেটুকু বলত তার থেকেও বেশি বিশ্বাস করতাম আমি। ঝুমরির মাথা খুব, বুদ্ধি ধ্বব। এত বুদ্ধি আর এত মাথা বলেই যেন ওর নিয়ম করে কৃষ্ণকুমারের কাছে বই। নিয়ে বসার দায়টাকে বড় কর্তব্য ভাবতাম না। ওর নাম সুলক্ষণা। পা থেকে মাথা পর্যন্ত সবটকই যেন তাই। আবার সুলক্ষণার ভিতরটা যদি নদীর মতো খরস্রোতা হয় তাহলে ওই পোশাকী নাম ছেড়ে

ঝুমরি নামটাই যেন সব থেকে মানায় ভাল। আমার চোখে ও আড়াল হলে সুলক্ষণা, সামনে এলে ঝুমরি।

বাড়ির লোকের অবিবেচনাপ্রসঙ্গে কৃষ্ণকুমার ওর রূপের কথা তুললে ঝুমরি মিটিমিটি হাসত আর আড়ে-আড়ে আমাকে লক্ষ্য করত। আমার মুখ থেকে নীরব সমর্থন ভিন্ন কোনো রকম মন্তব্য আশা করত না। দু-একটা কটাক্ষেই বুঝে নিত ভিতরে ভিতরে কতগুণ বেশি, সায় দিলাম। তারপর আরো বেশি মজা পেত যেন। চোখের তারায় আর ঠোঁটের ফাঁকের হাসির ছোঁয়াটুকু আরো তীক্ষ্ণ মনে হত, তখন। ফাঁক পেয়ে চাপা ঝাঝালো গলায় ঝিলিক তুলে একদিন আমাকে বলেছিল, আমার চেহারা নিয়ে কৃষ্ণদার তোমার কাছে মাথা ব্যথা কেন–আমাকে ভেতো বাঙালীর কাছে গছাবার মতলব নাকি!

জবাব হাতড়ে না পেয়ে হাসতে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু আমার বুকের তলায় যে ঝড় উঠেছিল সেও ওই মেয়ে ঠিকই আঁচ করেছিল মনে হয়।–

কৃষ্ণকুমারের মনে মুখে লাগাম নেই। ঝুমরির দুঃখের খবরও শুনিয়েছে আমাদের। আর একই প্রসঙ্গে নিজের মামারও রূঢ় সমালোচনা করেছে। মামার শিক্ষা-দীক্ষা আছে, কিন্তু স্বভাব-চরিত্র ভাল নয়। হৃদয় বলেও কিছু নেই। মামাটা জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে অকালে চোখ বুজেছে। বছর না ঘুরতে মামা একটা বাজে মেয়েছেলেকে বিয়ে করে ঘরে এনে তুলেছে। দুজনে মিলে মেয়েটাকে নির্যাতন করত। কিন্তু ঝুমরি মায়ের মতো মুখ বুজে সহ্য করার মেয়ে নয়। স্কুলের পরীক্ষা সারা হতেই এক জামাকাপড়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে। এলাহাবাদ থেকে খবর যেতে মারমুখী বাপ মেয়েকে শাসন করতে আর নিয়ে যেতে এসেছিল। সেই মামাকে কৃষ্ণকুমার বলতে গেলে ঘাড় ধাক্কা দিয়েই তাড়িয়েছে। রাজনীতিতে কৃষ্ণকুমার আমার থেকে অন্তত ঢের বেশি মাথা গলিয়েছিল। টানা ছমাস জেলও খেটেছে একবার। তাছাড়া তখনো কাল রোগে ধরেনি তাকে। নীতিগত ব্যাপারে সেই নরম-সরম মিষ্টি ছেলেটার এক ধরনের অনাপোস মেজাজ ছিল। গোঁ ছিল। ফলে আত্মীয় পরিজনেরা বেশ সমীহ করে চলত তাকে। মামা সেই যে প্রস্থান করেছে আর কোনোদিন মেয়ের খোঁজও নেয়নি।

জয়ন্ত রঙ্গ খুব মিথ্যে ঠাট্টা করেনি। সুলক্ষণাকে নিয়ে ওর সঙ্গে বেশ একটা রেষারেষি ছিল আমার। বলত, মনে ধরলেই বা ইউ. পি-র মেয়েকে নিয়ে বাঙালীবাবুর কি আশা! সুলক্ষণার সঙ্গে আমাকে কথা বলতে দেখলে সামনে চোখ পিটপিট করত, আড়ালে বিচ্ছিরি করে হাসত। রাজনীতির আলোচনায় গলা চড়ালেই টিপ্পনী। কাটত, ঝুমরি তো কাছেই বসে আছে, অত চেঁচিয়ে গলার শিরা ফোলানোর কি দরকার? ঝুমরির অনুপস্থিতিতে চুপ মেরে গেলেও জয়ন্ত হুল ফোঁটাতে ছাড়ত না। বলত, মেঘ দেখলে তবে ময়ুর নাচে। শ্রীমতী কাছে না থাকলে বাঙালীবাবুর। জিভ নড়ে না। কৃষ্ণকুমারকে চুপিচুপি একবার সতর্কও করে দিতে চেষ্টা করেছিল। শুনেছি। ঝুমরির ব্যাপারে আমার হাবভাব নাকি ভাল নয়। কৃষ্ণকুমার কানে তোলেনি। ঝুমরিকেই বলে দিয়েছিল। সে-কথা শুনে ঝুমরির কি রাগ। আমাকেই বলেছিল, ফাঁক পেলেই ও আমাকে কি জ্বালান জ্বালায় তোমরা তার খবর রাখো? কৃষ্ণদাকে বলি না বলে–

বললে খুশি হতাম। আমার হাবভাব যা-ই হোক তাতে কোনোরকম নোংরামি ছিল না। তবু এ-কথা ঠিক, আচমকা অতবড় একটা অঘটন ঘটে না গেলে ওই মেয়েকে নিয়ে নিজের বাড়ির লোকের সঙ্গে বড় রকমের কোনো বিদ্রোহের সূচনা হত কিনা বলা যায় না। ঝুমরিকে নিয়ে আমি সম্ভব অসম্ভব অনেক রকমের কল্পনার জালে জড়িয়ে পড়ছিলাম।

কৃষ্ণকুমারের ভবিষ্যৎবাণী ঠিক হয়নি। ঝুমরির ভালো বিয়ে হওয়া দূরে থাক, এ-ভাবে যে ও নিজের সর্বনাশ নিজে ডেকে আনতে পারে কেউ কল্পনাও করেনি। বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতোই বিমূঢ় হয়ে গেছলাম আমরা। ও বাড়ির লোকেরাও। এ আশ্রয় ছেড়ে, বিশেষ করে কৃষ্ণকুমারের মায়া ছেড়ে হঠাৎ এক রাতে ও নিখোঁজ হয়ে যেতে পারে–এমন অবিশ্বাস্য কাণ্ড কে ভাবতে পারে? কৃষ্ণকুমারের অবস্থা তখন ভাল নয়। কাল ব্যাধি। গলা দিয়ে প্রায়ই রক্ত ওঠে। ঝুমরির তার জন্য দুশ্চিন্তার। অন্ত ছিল না। কৃষ্ণকুমারের বাবা ছিলেন গোঁড়া কবিরাজ। নাম যশও ছিল। গোঁ ধরে ছেলের কবিরাজি চিকিৎসাই চালিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। তাঁর মতে আয়ুর্বেদের ওপর আর কোনো চিকিৎসা নেই। কৃষ্ণকুমারও তাই মেনে

নিয়েছিল কিনা জানি না। নিজের চিকিৎসা নিয়ে বাপের ওপর কখনো কথা বলেনি। কিন্তু আমরা বলতাম। ঘর ছাড়ার দিন কতক আগেও ঝুমরি আমাদের ওপরেই ফুঁসে উঠেছিল, কৃষ্ণদাকে তোমরা এখান থেকে নিয়ে চলে যেতে পারো না? অন্য চিকিৎসা করাতে পারো না? কৃষ্ণদা মরতে চলেছে দেখেও বুঝতে পারছ না?

বুঝতে পেরেও আমরা কিছুই করিনি বা করতে পারিনি। কিন্তু ঝুমরি এ কি করল? তার কৃষ্ণদাকে পর্যন্ত এত বড় আঘাত দিয়ে চলে গেল! শোনার পরেও ও সত্যি কারো সঙ্গে স্বেচ্ছায় ঘর ছেড়ে চলে গেছে এ কিছুতে বিশ্বাস করে উঠতে পারছিলাম না। ক্ষেপে গিয়ে কৃষ্ণকুমারের বাবা বার বার বলেছে, রক্তের দোষ। রক্তের দোষ যাবে কোথায়! বাপ যেমন মেয়ে তেমন। কৃষ্ণকুমারের মা বেচারীর লজ্জায় আর অপমানে মাথা নীচু। রক্তের দোষ বললে তারও লাগার কথা। নিজের ভাইয়ের মেয়ে, রক্তের যোগ তার সঙ্গেও আছে। ঝুমরির খোঁজে আমার ছোটাছুটি আর হয়রানি দেখে কৃষ্ণকুমারও শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়েই বলেছে, কোথাও পাবে না, যেখানেই যাক ও নিজের ইচ্ছেতেই গেছে। শুনে আমি দমে গেছি, কিন্তু বিশ্বাস হয়নি। ঝুমরির মধ্যে কোনো মন্দের ছিটেফোঁটাও আছে ভাবতে পারতাম না। হাসি-খুশি বুদ্ধিমতী মেয়েটা প্রয়োজনে তীক্ষ্ণ হতে পারে, কঠিন হতে পারে, সেটা বুঝতে পারতাম। বাপের কারণে হোক বা যে-কারণেই হোক ওর ভিতরটা যে খুব সুস্থির নয় তাও অনুভব করতে পারতাম। কিন্তু তা বলে ঝুমরির এমন মতি হবে, কৃষ্ণকুমার বললেও মন সেটা মেনে নিতে চায়নি। উল্টে বরং মনে হয়েছে বিপাকে পড়ে ঝুমরি হয়তো আমাকেই সব থেকে বেশি স্মরণ করছে। আমি আছি বলেই হয়ত তার উদ্ধারের প্রত্যাশা।

ফলে কৃষ্ণকুমার যা বলেছে সেটা আমাকে বিচলিত করলেও মনের সায় মেলেনি। সন্দেহটা প্রথমে যার ওপর ঘোরালো হয়ে উঠেছিল সে এই জয়ন্ত রঙ্গ। ও যে রসিকতা করল তা অবশ্য করিনি। গলায় হাত দিইনি। তবে তার দিক থেকে গলদ কিছু থাকলে গলা যে কাটা যাবেই হাবভাবে সেটা ওকে ভাল করেই বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। বড়লোকের ছেলে। চটুল মতি। মুখের কথা খসালে ঝুমরির জন্য অনেক খরচ করত। প্রায়ই সিনেমা দেখাতে চাইত, রেস্টুরেন্টে খাওয়াতে চাইত। ঝুমরি ওকে একেবারে যে বাতিল

করত তা নয়, কিন্তু আড়ালে বলত, পাজির পা-ঝাড়া একটা। কিন্তু আমি যদি কখনো বলি, ওকে প্রশ্রয় দাও কেনঝুমরি ফোঁস করে উঠেছে, বেশ করি, তোমার গায়ে জ্বালা ধরে কেন?

ঝুমরির চোখের আগুন আর ঠোঁটের হাসির এই রীতি। আর আমার চোখে এও তার রূপ। ও নিখোঁজ হবার পর জয়ন্তকে ধরে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে অনেক জেরা করেছি। আর আড্ডা দেবার ছলে কম করে পনের দিন কড়া নজরে রেখেছি ওকে। ওকে সঙ্গে করেই ঝুমরির খোঁজে এলাহাবাদ চষেছি।

জয়ন্ত রঙ্গকে বাতিল করার পর আর একটা বাজে লোককেও সন্দেহ হয়েছিল আমার। তার নাম মধু যাদব। বিহারের লোক। জীবিকার তাগিদে কেমন করে কৃষ্ণকুমারদের বাড়ি এসে জুটেছিল জানা নেই। ঝুমরি আসারও বছর দুই আগে থেকে ও-বাড়িতে ছিল সে। বয়সে আমাদের থেকে বছর তিনেক বড় হতে পারে। খাওয়া থাকা ছাড়া কৃষ্ণকুমারের বাবা সেই দিনে মাসে চল্লিশ টাকা মাইনে দিত ওকে। ফলে ঠিক চাকরের পর্যায়ে পড়ে না লোকটা। তবে বাড়ির লোক ফরমাশ করলে মুখ বুজে চাকরের কাজও করত। আর ঝুমরি বললে তো কথাই নেই। মুখের কথা খসালে গন্ধমাদন বয়ে নিয়ে আসবে। আড়ালে আবডালে আমরা ঠাট্টা করতাম সীতা দেবীর হনুমানের মতোই সুলক্ষণার ভক্ত হনুমান মধু যাদব। শুনে ঝুমরিও হাসত খুব। কখনো বলত, দাঁড়াও বলছি ওকে।

লোকটার গায়ের জোর কখনো পরখ করে দেখার সুযোগ হয়নি। তবে দেখলেই মনে হত অসুরের শক্তি রাখে। ঝুমরি উসকে দিলে আমাদের ধড় থেকে মাথা ছিঁড়ে নেওয়াও ওর পক্ষে অসম্ভব নয় হয়তো। মিশকালো গায়ের রঙ। খুব লম্বা নয় আবার বেঁটেও নয়। এক মাথা ঝাকড়া চুল, ড্যাবডেবে দুটো চোখ। সে-চোখে পলক পড়তে দেখা যায় না বড়। মুখের দিকে চেয়ে থাকলে অস্বস্তি হয়। ওর মধু নাম একটা বিতিকিচ্ছিরি রসিকতা যেন।

ওর আসল কাজ কবিরাজির মালমশলা সংগ্রহ করা আর ওষুধ বানানোর ব্যাপারে কৃষ্ণকুমারের বাবাকে সাহায্য করা। বনবাদাড়ে ঘুরে ঘুরে ওষুধের

শিকড়-বাকড়, লতাপাতা, ফলমূল যোগাড় করে আনে। কোন জিনিসগুলো মনিবের বেশি দরকার এ ক বছরে ভালই বুঝে নিয়েছে। ওর অপলক ড্যাবডেবে চাউনির কথা উঠলে কৃষ্ণকুমার হেসে বলত, ওর চোখ আছে, বাবা একবার যা ওকে দেখিয়ে দেয় সহজে ভোলে না। ঠিক চিনে নিয়ে আসে। কৃষ্ণকুমারের বাবা শুধু বিচক্ষণ নয়, টাকা-কড়ির ব্যাপারেও বেশ একটু হাত-টান আছে। তা সত্ত্বেও ভদ্রলোক সেই দিনে খাওয়া পরার ওপরে মাসে চল্লিশ টাকা মাইনে কেন ওকে দেন সেটা আঁচ করা যেত। বনে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে মধু যা সংগ্রহ করে আনত সে-সব আর বাজার থেকে কিনতে হত না। ফলে অনেক সাশ্রয় হত। তারপর সেসব বাছাবাছি করে ধুয়ে শুকিয়ে গুঁড়িয়ে পিষিয়ে কবিরাজ মশায়ের হাতের কাছে এনে মজুত করা কম ধকলের ব্যাপার নয়। কিন্তু মধু যাদব অনায়াসেই তা করত। যেন কলের মানুষ একটা যন্ত্রের মতোই খাটতে পারে।

এ-হেন মানুষের একটু রসজ্ঞানের পরিচয়ও আমরা পেতাম, আর নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করতাম। সুলক্ষণা বা ঝুমরির গানের গলাটি ভাল ছিল। যেমন লোকই হোক, গান-বাজনার প্রতি ঝোঁক ছিল ওর বাবার। মাস্টার রেখে মেয়েকেও একটু আধটু। শেখাতে চেষ্টা করেছিল। এখানে আসার পর কৃষ্ণকুমার সে-ব্যবস্থা বাতিল হতে দেয়নি। সামান্য মাইনেয় তার খাতিরের এক বুড়ো ওস্তাদের বাড়ি গিয়ে ঝুমরি গান শিখত। মাঝে মাঝে ওস্তাদও বাড়িতে আসতেন। কৃষ্ণকুমারের বাবা ওই কটা টাকাই বাজে খরচ ভাবত। কিন্তু ছেলের ব্যবস্থা নাকচ করার সাহস তার ছিল না। এই গান শেখার ব্যাপারেও ঝুমরির খুব যে একটা নিষ্ঠা ছিল তা নয়। তবে ওর গলা মিষ্টি, আর গানের ঢংটুকু আমার চোখে অন্তত আরো মিষ্টি। মেজাজ এসে গেলে গান গাইতে গাইতে অল্প অল্প দুলত, কালো চোখের গভীরের হাসির ছোঁয়াটুকু তখন অদ্ভুত মায়াচ্ছন্ন মনে হত। ঝুমরির গানের সব থেকে সেরা আর নারব ভক্ত ছিল বোধকরি মধু যাদব। বাইরের অন্ধকার দাওয়ায় একখানা পাথরের মূর্তির মতো চুপচাপ বসে থাকত। যতক্ষণ গান চলত ওর নড়াচড়া নেই। সে-সময় কেউ কোনো কাজের ফরমাশ করলে ও একদম কালা বনে যেত। নেহাত বাড়ির কর্তা বা কর্ত্রীর ডাক না পড়লে দাওয়া থেকে ওকে নড়ানো যেত না। আগে শুনেছি,

ঝুমরির গানের সময় ও নাকি দরজার সামনেই এসে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকত। ঝুমরি নিষেধ করার পর আর দাঁড়ায় না। নিষেধ না করে উপায় কি, চোখের ওপর ও-রকম সঙের মতো দাঁড়িয়ে থাকলে ঝুমরির হাসি পেয়ে যায়।

ঝুমরি বাড়ি থেকে নিখোঁজ হবার মাত্র তিন সপ্তাহ আগে এই মধু যাদবকে বাড়ি থেকে তাড়ানো হয়েছিল। তার আগে দস্তুরমতো থানা পুলিস করা হয়েছিল ওকে নিয়ে। চুরির ব্যাপার। ঝুমরির হার চুরি। সে-চুরি ঝুমরি বলতে গেলে স্বচক্ষেই দেখেছে। ওর মায়ের হার। মায়ের স্মৃতি। ওটার ওপর যে ঝুমরির অত মায়া জানতাম না। আমার ধারণা মধুকে তলায় তলায় একটু স্নেহই করত ও। কিন্তু হার খোয়া যাওয়া আর প্রায় হাতে-নাতে ধরা পড়ার পরেও মধুকে অস্বীকার করতে দেখে ঝুমরি রাগে ঠক ঠক করে কাঁপছিল। দু চোখে আগুন ছুটেছিল। বাথরুম থেকে সবে স্নান সেরে বেরিয়েছে। হারটা খুলে তাকের ওপর রেখেছিল। ওটা ফেলে এসে নিজের ঘরের আয়নার সামনে দাঁড়াতেই চোখে পড়েছে গলায় হার নেই। তক্ষুনি আবার ফিরে আসতে দেখে বাথরুমে মধু কলের নিচে বালতি বসিয়েছে। মনিবের স্নানের জল রোদে দেবে। বাথরুমের দোরগোড়া থেকেই ঝুমরি দেখে তাকের ওপর হারটা নেই। ধরেই নিল, হার পড়ে আছে দেখে মধু তাকে দেবার জন্যেই নিয়েছে ওটা। হাত বাড়িয়ে বলেছে, দাও

জবাবে মধু ড্যাব ড্যাব করে মুখের দিকে চেয়ে রইল শুধু।

বিরক্ত হয়ে ঝুমরি আবার বলেছে, কি হল, হারটা দাও?

এবারে মধু নিজে থেকেই ঘুরে দেয়ালের তাকটা দেখেছে। তারপর তার দিকে ফিরেছে। আবার অপলক চাউনি, মুখে কোনো রকম ভাববিকার নেই।

ঝুমরিকে সহিষ্ণু মেয়ে কেউ বলবে না। ঝাঁঝিয়ে উঠল, হাঁ করে দেখছ কি চেয়ে, ওই তাক থেকে তুমি হারটা তোলোনি?

মধু মাথা নেড়েছে। তোলেনি।

www.bengaliebook.com

আর যায় কোথায়। ঝুমরির মাথায় রক্ত উঠে গেল। সে চেঁচিয়ে উঠল, চালাকি পেয়েছ? এক মিনিট হয়নি, আমি ঘরে গেছি আর এসেছি, এর মধ্যে তুমি ছাড়া আর এখানে কে ঢুকেছে? হারটা আকাশে উড়ে গেল? ভাল চাও তো এক্ষুনি দিয়ে দাও!

মধু আবার মাথা নাড়ল। সে নেয়নি, অথবা সে কিছু জানে না।

ক্ষিপ্ত হয়ে ঝুমরি পিসির কাছে ছুটল। বাড়িতে এ-সময় ঝি-চাকর কেউ নেই। এর মধ্যে একমাত্র পিসী যদি বাথরুমে ঢুকে থাকে আর হার তুলে থাকে। যদিও জানে তা হতে পারে না, কারণ পিসী তখন রান্নায় ব্যস্ত। মোটা শরীর নিয়ে তার রান্নাঘর থেকে এ-পর্যন্ত আসতেই দু-চার মিনিট লাগার কথা।

যা ভেবেছিল তাই। পিসীও শুনে আকাশ থেকে পড়ল। রাগে কাঁপতে কাঁপতে ঝুমরি আবার এদিকে ছুটে এলো। সেই সঙ্গে হাঁকডাক করে আমাদেরও ডাকল। কিন্তু এটুকু সময়ের মধ্যেই বাথরুম ছেড়ে মধু হাওয়া। সব শুনে আমরা স্তম্ভিত। বাড়িতে আর কাক-পক্ষী নেই। এক মিনিটের মধ্যে ফিরে গিয়ে ঝুমরি ওকেই দেখেছে বাথরুমে। হারের খোঁজ নেবার সঙ্গে সঙ্গে লোকটা তাকের দিকে তাকিয়েছে বোকার মতো। অর্থাৎ যেখানে হার ছিল সেখানে আপনা থেকেই চোখ গেছে। আর ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বালতি ফেলে ও নিখোঁজ। ও যে হার নিয়েছে তাতে আর সন্দেহের কি থাকতে পারে? কিন্তু আমরা আরো হতবাক এই কারণে, মধু শেষ পর্যন্ত ঝুমরির জিনিস চুরি করতে পারে। এর থেকে অবিশ্বাস্য আর যেন কিছু নেই। আর ঝুমরিরও হয়তো এত রাগ সেই কারণেই। তলায় তলায় ওই লোকটাকে সে নিজের দাসানুদাস ভাবত। রাগে জ্বলে জ্বলে বার বার বলতে লাগল, এই চুরি একরকম স্বচক্ষেই দেখেছি আমি–যখন চাইলাম তখন হার ওর কাছেই ছিল–বোকার মতো মামীর কাছে ছুটে যেতেই হার সরানোর জন্য ও চোখে ধুলো দিয়ে গেল।

বেশ একটা উত্তেজনার হাওয়া থিতিয়ে উঠল বাড়িতে। কৃষ্ণকুমারের বাবাও সব শুনে স্তম্ভিত। কৃষ্ণকুমারও নির্বাক। মোট কথা, মধু এ-রকম কাজ করতে পারে কারো কল্পনার মধ্যেও ছিল না।

বেশি খোঁজাখুঁজি করতে হল না। আধ ঘন্টার মধ্যে ও মূর্তি নিজেই এসে হাজির আবার। তেমনি ড্যাবডেবে চাউনি, ভাবলেশশূন্য মুখ। এ-রকম বিশ্বাসঘাতকতার ফলে বাড়ির কর্তা অর্থাৎ কৃষ্ণকুমারের বাবারও অগ্নিমূর্তি। সে আসার সঙ্গে সঙ্গে হুমকি দিয়ে উঠলো, হার বার কর।

মধু মাথা নাড়ল। নেয়নি বা জানে না।

কর্তা ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিল গালে।–নিসনি তো হার গেল কোথায়? বার কর শিগগির।

কালো মুখে চড়ের লালচে দাগ পড়ে গেল। চুপচাপ কর্তার মুখের দিকেই চেয়ে। রইল সে।

কর্তা গর্জে উঠলো, এই আধঘণ্টা কোথায় ছিলি তুই? কোথায় গেছলি?

মধু জবাব দিল, দিদিমণি চোর বলাতে দুঃখ হল, তাই বাগানে বসেছিলুম।

এর মধ্যে আমরা ওর খোঁজে বাগানে ঘুরে এসেছি। এই মিথ্যেও হাতে-নাতে ধরা। পড়ল। অব্যক্ত রাগে হাত আমাদেরও নিশপিশ করছিল। কিন্তু আমাদের চেঁচামেচির জবাবে ও যে-ভাবে তাকাচ্ছিল এত বড় অপরাধের পরেও কি জানি কেন গায়ে হাত তোলার সাহস আমাদের হল না।

কর্তাই আরো কটা চড়চাপড় বসালো, অনেক ভয় দেখালো, ভাল কথায়। হার ফেরত দিতে বললো, কিন্তু মধুর কানে তুলো, পিঠে কুলো। শেষে পুলিসে খবর দেওয়া হল। তারা ওকে থানায় ধরে নিয়ে গিয়ে তিন দিন আটকে রেখে অনেক জেরা করল, মারের চোটে হাড় গুঁড়িয়ে দেবার উপক্রম করল, কিন্তু কবুল। করাতে পারল না। ফলে ছেড়ে দিয়ে ওর ওপর চোখ রাখার মতলব ফাঁদল তারা। তখন সন্ধ্যা হয় হয়। বাড়ির দাওয়ায় না এসে মধু সোজা বাগানে নিজের ঘরে। গিয়ে ঢুকল। রাতে খেতেও এলো না।

www.bengaliebook.com

কেউ ডাকেনি ওকে। পরদিন ভোরে ওর আর টিকি দেখল না কেউ। আবার পুলিসে খবর গেল। কিন্তু পুলিসও তার নাগাল পেল না।

মধু যাদবের অধ্যায় এখানেই শেষ। আর কখনো কেউ তাকে এলাহাবাদেই দেখেনি। মায়ের স্মৃতি ঝুমরির সেই হার খোয়া যেতে আমাদেরও একটু দুঃখ হয়েছিল। বটে, কিন্তু ওই মূর্তি বিদেয় হবার ফলে এক ধরনের স্বস্তি বোধ করেছিলাম। লোকটা যেন জানত, অসুখের দরুন কৃষ্ণকুমারকে সঙ্গ দিতে আসা, বা রাজনীতি আলোচনার লোভে এ-বাড়িতে ছুটে-ছুটে আসার লোভটাই সব নয়, এ ছাড়াও আরো কিছু বাড়তি আকর্ষণ আছে। ভাবলেশশূন্য মুখে ড্যাবড্যাব করে চেয়ে থেকে ও যেন এটুকুই ভাল করে বুঝিয়ে দিত আমাদের। এমনও মনে হয়েছে, কখন না জানি টুটি টিপে ধরে। সোজা যমের দোর দেখিয়ে দেয়।

এই লোক গেছে আপদ গেছে।

মধু যাদব বিদেয় হবার তিন সপ্তাহের মধ্যে সুলক্ষণা উধাও। আগের দিনও তাকে দেখেছি, কথা বলেছি। আমাদের মনে এতটুকু খটকা লাগার মতো কোনো কারণ ঘটেনি। ওর হাব-ভাব আচরণের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম চোখে পড়েনি আমাদের। কেবল শেষের দিন দশ-বারো কৃষ্ণকুমারের সেবাযত্ন বেশি করছিল। আর, একটা জলজ্যান্ত লোক বাপের চিকিৎসার দম্ভের চোটে কোন খেয়া পাড়ি দিতে চলেছে, অথচ আমরা চোখ কান বুজে বসে আছি–ইদানীং সেই ঝঝের কথাও একটু বেশি শোনা যাচ্ছিল। এর কোনোটাই ও-মেয়ের ভিতরের কোনো মতলবের নজির নয়। তাই খবরটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমরা হকচকিয়ে গেছি, দিশেহারা হয়েছি। কৃষ্ণকুমারেরও একই রকম অবস্থা প্রথম। তারপর হঠাৎ কি রকম যেন ঠাণ্ডা মেরে গেছে। বিবর্ণ পাংশু মুখ। তার পাশে বসেই তার বাবার তর্জন-গর্জন শুনেছি। স্ত্রীর মানসিক অবস্থা দেখে ভদ্রলোকের মেজাজ আরো বেশি তপ্ত। চিৎকার করে থেকে থেকে এক কথাই বলেছিলো।–কার জন্য এমন হা-হুঁতাশ করছ, কি জন্য খবর করতে বলছ? যে মেয়ে এ-ভাবে মুখে চুন-কালি দিয়ে চলে গেল, খুঁজে-পেতে তাকে ধরে এনে আবার ঘরে ঢোকাব? একেবারে মুখ বুজে বসে থাকো, কেউ জিজ্ঞেস করলে বলে দেবে

বাপের বাড়ি চলে গেছে। গেছে কিনা তোমার ভাইকে একটা চিঠি লিখে দেখতে পারো। যাক না যাক, এখানে আর জায়গা হবে না এও পষ্ট করে জানিয়ে দিও।

এ-ঘরে বসে সবই শোনা যাচ্ছিল। বিমনার মতো কৃষ্ণকুমার আমার মুখের দিকেই। চেয়েছিল। একটা ক্লান্ত নিঃশ্বাস ফেলে বলেছিল, ঝুমরি সেখানে যায়নি, যেতে পারে না।

কৃষ্ণকুমারের বিবেচনার ওপর আমার অটুট আস্থা। সঙ্গে সঙ্গে সেই সম্ভাবনা আমিও বাতিল করেছি। আর তিন দিনের মধ্যে খবরও এসেছে ঝুমরি সেখানে নেই। সেখানে যায়নি। কিন্তু কৃষ্ণকুমারের বাবার কথার মধ্যেও সত্যের ছিটে-ফোঁটা আছে। বলে ভাবিনি। নিজের এত বড় সর্বনাশ ঝুমরি স্বেচ্ছায় ঘটাতে পারে না। বড় রকমের অঘটনই ঘটে গেছে কিছু। চরম কোনো বিপদে পড়ে ঝুমরি হয়তো নিঃশব্দে আর্তনাদ করছে, হাহাকার করছে। ঝুমরির চোখে যে-আগুন জ্বলে, নরক-যন্ত্রণার মধ্যে পড়ে দিবা-রাত্র এখন হয়তো সেই আগুন জ্বলছে। কৃষ্ণকুমারের বাবার কথা শুনে উল্টে ভদ্রলোককে নির্মম নিষ্ঠুর মনে হয়েছে আমার। চেনা-জানা মুখগুলো আঁতিপাতি করে খুঁজেছি তারপর। কে হতে পারে? ঝুমরির এত বড় সর্বনাশ কে করতে পারে?

জয়ন্ত রঙ্গ খুব একটা জোরালো লোক নয়। কিন্তু বাপের টাকার জোর আছে। ঝুমরিকে ঘিরে ওর বাসনার আঁচও পেতাম। বাসনা বেপরোয়া হয়ে উঠলে মানুষ অমানুষ হতে কতক্ষণ। তাছাড়া এ-পর্যন্ত তার দেখা নেই কেন? এ-পর্যন্ত বলতে পরদিন এই সকাল পর্যন্ত। সব দিনের মতোই ঝুমরি খেয়েদেয়ে কলেজ গেছল। সেই কলেজ থেকে আর ফেরেনি। একটা রাত কেটে গেছে। পরদিন সকাল নটায় কৃষ্ণকুমারের কাছে এসে দেখি, নির্বাক বিবর্ণ মুখ। বাড়ির হাওয়া থমথমে। কিছু বোঝার আগেই কৃষ্ণকুমার বিড়বিড় করে বলেছে, ঝুমরি আমাদের ছেড়ে চলে গেছে, কাল কলেজ থেকে আর বাড়ি ফেরেনি।

খবরটা এমন আকস্মিক যে আমার বুঝতেই সময় লেগেছিল। ফ্যাল ফ্যাল করে ওর দিকেই চেয়েছিলাম আমি। কৃষ্ণকুমার আবার বলল, কলেজে খোঁজ করা হয়েছিল, ঝুমরি কাল কলেজে মোটে যায়ইনি।

আমি হতভম্ব। বুকের তলায় ঠক-ঠক কাপুনি ধরেছিল। ঠিক সেই সময় বাইরে থেকে ঘরে ফিরেছে কৃষ্ণকুমারের বাবা। গনগনে ধারালো মুখ। ছেলের মুখের ওপর একটা বিরক্তির ঝাপটা মেরে ভিতরে চলে গেছে। তারপর ভিতর থেকে ওই তর্জন গর্জন শোনা গেছে।

ঝুমরি বাপের বাড়ি যায়নি, যেতে পারে না, কৃষ্ণকুমারের মুখে কথা শোনার পর আর বেশিক্ষণ ওর কাছে বসে থাকতে পারিনি। জয়ন্ত রঙ্গর চপল মুখ বার বার চোখের সামনে এগিয়ে আসছিল। সাইকেল নিয়ে সোজা তার বাড়ি ছুটেছি। ধমনীর রক্ত তখন টগবগ করে ফুটছে। আমার সবুজ পৃথিবী নিমেষে বর্ণশূন্য হয়ে গেছে। সেই রিক্ত আগুন-ঝরা পৃথিবীর এখন ভেঙে ফেটে চৌচির হবার প্রতীক্ষা শুধু।

কিন্তু দিন-কয়েক যেতেই বোঝা গেছে জয়ন্ত রঙ্গ নয়। ওর সেই সাহস নেই, সেই মেরুদণ্ড নেই। তারপরে আরো মনে হয়েছে, জয়ন্তর মতো ছেলেকে ঝুমরি। অনায়াসে নিজেই ঢিট করতে পারে। ওর ওপর দখল নিতে পারে এমন মরদ এই ছেলে নয়।

জয়ন্ত রঙ্গকে বাতিল করার পরে চকিতে আর একটা সন্দেহ মনে এসেছে আমার। আর তক্ষুনি সেই সম্ভাবনাই অবধারিত মনে হয়েছে। এর ঢের আগেই ঝুমরির বাপের। বাড়ি থেকেও খবর এসেছে সে সেখানেও যায়নি। তাহলে?

তাহলে মধু যাদব। একমাত্র সে ছাড়া কার আর এত বড় দুঃসাহস হতে পারে? হার চুরি দূরের কথা, আমার বদ্ধ ধারণা অনায়াসে ওই শয়তান মানুষও খুন করতে পারে। একটাও স্নায়ু কাপবে না, একটুও হাত কাঁপবে না। সে ভিন্ন বাড়ি ছাড়ার মাত্র তিন সপ্তাহের মধ্যে এত বড় অঘটন ঘটে কি করে? এই পৃথিবীতে ঝুমরির ওপরেই তো সব থেকে বেশি রাগ তার। ওর জন্যেই পুলিস তাকে তিন দিন থানায় আটকে বেদম মার মেরেছে। সে-

মারের এ-রকম প্রতিশোধ একমাত্র ওই লোকেই নিতে পারে। তা ছাড়াও আমার স্থির বিশ্বাস ঝুমরিকে নিয়ে প্রথম থেকেই খারাপ মতলব ছিল ওর। ঝুমরি যদি সীতা দেবী হয়, ও তার হনুমান নয়। রাবণ। এ-কাজ ওর ছাড়া আর কারো নয়।

মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাথায় আগুন জ্বলেছে। আবার অসহায় বোধ করেছি কেমন। ওই নৃশংস মানুষটার কবল থেকে ঝুমরির মুক্তির আশা দুরাশাই বুঝি।

..কিন্তু এ-সম্ভাবনার কথা কৃষ্ণকুমারের বাবা মায়ের মনে এলো না কেন? বিশেষ করে কৃষ্ণকুমারের মাথায় এলো না কেন? থানায় খবর দিয়ে মধুর নামে হুলিয়া বার করা হল না কেন? এখনো সময় আছে। কৃষ্ণকুমারের কাছে ছুটে এলাম আমি।

সন্দেহের কথা শুনে কৃষ্ণকুমার চুপচাপ মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিক। এতটুকু উত্তেজনার আভাস না পেয়ে উল্টে অবাক। একটু বাদে ও ক্লান্ত স্বরে জবাব দিল, তা নয়, ঝুমরি নিজের ইচ্ছেতে অন্য কারো সঙ্গে চলে গেছে।

অবিশ্বাসের সুরে আমি জোর দিয়ে বলে উঠলাম, তুমি কি করে জানলে? এ হতেই পারে না–আমি এক্ষুনি থানায় গিয়ে যা করার করে আসি।

কৃষ্ণকুমার আবার খানিক চুপ করে থেকে মাথা নাড়ল শুধু। অর্থাৎ আমাকে নিষেধ করল। তারপর আস্তে আস্তে যে কথাগুলো বলল, শুনে ভয়ানক দমে গেলাম আমি।…সেদিন সকালে কলেজ যাবার আগে পর্যন্ত ঝুমরি নাকি প্রায় সারাক্ষণ কৃষ্ণকুমারের কাছেই ছিল। এগারোটায় কলেজ, সকাল সাড়ে দশটা পর্যন্ত। তার সেবা যত্ন করেছে, নিয়ম করে ওষুধ-পত্র খাওয়া আর সময়ে ঘুমনোর ব্যাপারে পাকা গিন্নীর মতো উপদেশ দিয়েছে। বেলা সাড়ে দশটার সময় উঠে গিয়ে সামান্য কিছু নাকে মুখে গুঁজে কলেজ যাবার জন্য তৈরি হয়ে আবার ঘরে এসেছে। বলেছে, মাথাটা। একটু তোলো দেখি

কিছু না বুঝেই কৃষ্ণকুমার উঠে বসেছিল। বলা নেই কওয়া নেই ঝুমরি তার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে একটা প্রণাম সেরে নিল। অবাক হয়ে কৃষ্ণকুমার জিজ্ঞাসা করেছে, কি ব্যাপার রে, পরীক্ষা-টরীক্ষা কিছু নাকি?

ঝুমরি হেসেই জবাব দিয়েছে, দারুণ পরীক্ষা, জীবন-মরণ নির্ভর একেবারে।

হাসতে হাসতে চলে গেছে।

বেদনা-বিবর্ণ মুখে কৃষ্ণকুমার বলেছে ও আর ফিরবে না জেনেই প্রণাম করে গেছে আর ওই কথা বলে গেছে। তারপর কৃষ্ণকুমার ওর কলেজের দুজন পরিচিতা শিক্ষয়িত্রীকে ডেকে খবর নিয়েছে। পরীক্ষা-টরীক্ষা কিছুই ছিল না সেদিন। তাদের মুখ থেকেই শুনেছে, পাঁচ-সাতদিন আগে থেকেই মাঝে মাঝে ক্লাস পালানো শুরু করেছিল ঝুমরি। ওই শিক্ষয়িত্রীদের একজনের মেয়ে ঝুমরির সঙ্গে পড়ে। সে নাকি তার মাকে বলেছে, একটা মস্ত ঝকঝকে বিলিতি গাড়িতে একজনের পাশে বসে ঝুমরিকে এখানে-সেখানে যেতে দেখেছে। কলেজের অনেক মেয়েই দেখেছে।

আমার মুখে আর একটিও কথা সরেনি। কৃষ্ণকুমারকে আর কোনো সান্ত্বনার কথা বলতে পারিনি। নিজের বুকের তলায় যে কাটা-ছেঁড়া চলেছিল তাও প্রকাশ। করতে পারিনি। কৃষ্ণকুমারদের বাড়ি আসাই কমিয়ে দিয়েছিলাম এর পর। একটা মেয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেছে বলে নয়, কৃষ্ণকুমারের মুখখানা বড় বেশি অসহায় আর করুণ মনে হত। মেয়েটা যেন ওর জীবনের শেষ সলতেটা নিভিয়ে দিয়ে চলে গেছে।

বিতৃষ্ণা-ভরা একটা আক্রোশ নিয়েই সেই মেয়েকে আমি মন থেকে হেঁটে দিচ্ছিলাম। কিন্তু মাঝেসাঝে চেনা-পরিচিত মুখের মারফত দু-একটা খবর কানে আসত। সুলক্ষণা দয়ালকে কখনো লক্ষ্ণৌর ওমুক অভিজাত হোটেলে দেখা গেছে, কখনো বেনারসে কখনো বা আলমোড়ায়। আমার মনে হত, ওই রসের খবর যারা দিচ্ছে। তলায় তলায় তারা মুচকি-মুচকি হাসছেও। আমাকে বিধতে চায়। কিন্তু আমি আর বিদ্ধ হতে রাজি নই। কে সুলক্ষণা দয়াল তাই যেন চট করে মনে পড়ত না আমার।

কিন্তু ঘর ছাড়ার ঠিক এক বছর দু মাস বাদে এক বিজাতীয় আক্রোশে ওই সুলক্ষণা দয়ালকেই মনে মনে সব থেকে বেশি খুঁজেছিলাম আমি। কৃষ্ণকুমার মারা গেল। শেষ নিঃশ্বাস ফেলার আগে ওর শূন্য দু চোখ একবার ঘরের মধ্যে চক্কর খেয়ে কাউকে যেন খুঁজেছিল। এর পরেই যদি সুলক্ষণা দয়ালের দেখা পেতাম কোথাও, আর এ-খবরটা যদি সকলের আগে হেসে হেসে তার কানে তুলে দিতে পারতাম!

বাইশ বছর বাদে জয়ন্ত রঙ্গর মুখে আবার সেই সুলক্ষণা-প্রসঙ্গ।

এবারে গোড়ায় হঠাৎ ঠাওর করতে না পারাটা ভনিতা কিছু নয়। বাইশ বছরে গঙ্গায় অনেক জল বয়ে গেছে, বুকের তলার অনেক নরম জায়গায় শুকনো চড়া পড়ে গেছে। কিন্তু মানুষের একটা বয়েস চিরকালই বোধহয় নিজের অগোচরে কোনো এক জায়গায় আটকে থাকে। বিস্মৃতির পর্দাটা সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই আগের দিনের মতোই নাড়াচাড়া খেলাম একপ্রস্থ। ভিতরটা উন্মুখ হয়ে উঠল।

হেসে একটা চোখ একটু ছোট করে জয়ন্ত বলল, কত হবে বলো তো তোমার। ঝুমরির বয়েস এখন? কম করে বিয়াল্লিশ-তেতাল্লিশ না?...কিন্তু এখনো বেশ মাইরি! আগের থেকে সামান্য মোটা হয়েছে, গায়ের রং এখন ফর্সাই বলতে পারো, এক-পিঠ খোলা চুল, ইচ্ছে করলে এখনো সেই আগের মতো হাসতে পারে–তাকাতেও পারে।

শ্লেষের সুরে জিজ্ঞাসা করলাম, হরিদ্বারে কি করছে–জপ-তপ আর প্রায়শ্চিত্ত?

-তাই তো বলল। আমি খোঁজ নিতে দিব্যি হেসে জবাব দিলে, সব খুইয়ে আমার মতো মেয়েরা শেষে কাশী মথুরা বৃন্দাবন বা হরিদ্বার ছাড়া আর কোথায় এসে ঠেকবে?

কিন্তু খুব একটা প্রায়শ্চিত্ত করছে বলে জয়ন্তর মনে হয়নি। রসিকতার মেজাজটি এখনো নাকি দিব্যি আছে।

…জয়ন্ত রঙ্গর সঙ্গে সুলক্ষণা দয়ালের দেখা হয়েছিল বিকেলের হর-কী-পিয়ারী ঘাটে। সকালের দিকে সেখানে পুণ্যার্থীদের চিড়ে-চ্যাপ্টা ভিড়, বিকেলের দিকে হাওয়া বিলাসীদের। জয়ন্ত রঙ্গ চুপচাপ দাঁড়িয়ে গঙ্গার শোভা দেখছিল, ছেলে-ছোকরাদের শিকল-ধরে গঙ্গায় হুটোপুটি খাওয়া দেখছিল। কোত্থেকে একজন মহিলা পাশে এসে রাজ্যের বিস্ময় গলায় ঢেলে জিজ্ঞাসা করল, ও মার সাহেব না?

তাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গ চিনেছে, কারণ চেহারায় শুধু বয়েসের প্রসন্ন ছোঁয়া লেগেছে একটু–কিছুই খোয়া যায়নি।

অনেক কাল বাদে অন্তরঙ্গ বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলে যেমন হয় তেমনি আনন্দ সুলক্ষণার। জয়ন্তকে ঘাট থেকে একটা নিরিবিলি দিকে টেনে নিয়ে গেছে। গঙ্গার ধারে দুজনে পাশাপাশি বসেছে। নিজের প্রসঙ্গে প্রায় কোনো কথাই বলেনি বা বলতে চায়নি। জয়ন্ত কিছু জিজ্ঞাসা করলে মুখ টিপে হেসেছে, আর শেষ বয়সে তাদের মতো মেয়েদের যে এ-সব জায়গাতে আশ্রয়–সেই কথাই বলেছে। কিন্তু সেই বলার। মধ্যেও কোনো পরিতাপ ছিল না।

জয়ন্ত ঠাট্টা করেছে, শেষ বয়েস বলে তো একটুও মনে হচ্ছে না তোমাকে দেখে?

জবাবে হেসে ভ্রূকুটি করেছে সুলক্ষণা। বলেছে, এখনো তোমার চোখের দোষ। রোসো, নিজের এই চুলের বোঝা ছেটে ফেলব ভাবছি, তাহলে তোমাদের আর অসুবিধে। হবে না।

নিজের কথা কিছু না বললেও বিশেষ করে আমার কথা নাকি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করেছে সুলক্ষণা। কৃষ্ণকুমারের নামও মুখে আনেনি। এই থেকেই বোঝা গেছে সে-যে নেই সেটা ও জানে। জয়ন্ত বলল, তুমি লিখে নাম-টাম করেছ শুনে সুলক্ষণা যেমন অবাক তেমনি খুশি। তোমার বউয়ের কথা আর ছেলেপুলের কথা শুনতে চাইল–আমি আর কতটুকু জানি যে বলব।

আবার দেখা করার জন্য জয়ন্ত রঙ্গ তার হরিদ্বারের আস্তানার হদিস পেতে চেয়েছিল। ঘুরিয়ে সে-আবেদন নাকচ করেছে সুলক্ষণা। তরল জবাব দিয়েছে, ঠিকানা আর কোথায়, ঠিকানাই তো খুঁজে বেড়াচ্ছি। যদি থাকো তো এই হর-কী-পিয়ারীর ঘাটেই দেখা হবে আবার।

আরো তিনদিন হরিদ্বারে ছিল জয়ন্ত রঙ্গ। তিনদিনই ঘাটে এসে ঘণ্টা-দুঘণ্টা করে অপেক্ষা করেছে। সুলক্ষণা দয়াল আর আসেনি। আর দেখা হয়নি।

জয়ন্ত রঙ্গ চলে যাবার পর এক মাস কেটে গেছে। স্বাভাবিক ভাবেই সুলক্ষণা দয়ালের কথা আবার ভুলেছি। এক মাস বাদে হঠাৎ দিল্লীতে একটু কাজ পড়ে গেল আমার। আর দুদিনের মধ্যে সে-কাজও শেষ হয়ে গেল। আমার ফিরতি টিকিটের তারিখে পৌঁছুতে মাঝে পাঁচটা দিন বাকি এখনো। এই পাঁচ-পাঁচটা দিন কি করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। দিল্লী আমার কাছে প্রায় কলকাতার মতোই পুরনো।

রাতের নিরিবিলিতে হঠাৎ সুলক্ষণা দয়ালের কথা মনে পড়ে গেল। আবার দেখা হওয়াটা ভবিতব্য ছিল বলেই হয়তো মনে পড়ল। ছেলেবেলার মতো এখন আর তে রকম ভাবপ্রবণ তাড়না কিছু থাকার কথা নয়–ছিলও না। তাছাড়া মনের যে আসন থেকে সেই মেয়ে সরে গিয়ে প্রবৃত্তির পাতালে ডুব দিয়েছে–তারপর সে হরিদ্বারেই থাকুক বা মথুরা বৃন্দাবন করে বেড়াক–সেই আসনে আর সে কোনোদিন ফিরে আসবে না জানি। তবু তাকে আর একটি বার দেখার জন্য ভিতরটা কেমন উন্মুখ হয়ে উঠল।

দিল্লী থেকে সকালে হরিদ্বারের লাক্সারি বাস ছাড়ে। ভিড়ের সময় নয়, বাসের টিকিট পেলাম। বাস নুটায় ছাড়ে, আড়াইটে তিনটের মধ্যে হরিদ্বারে পৌঁছয়।

বাসে বসেও অনেক বার মনে হয়েছে নেমে যাই। ফিরে যাই। বাইশ বছর আগের সব স্মৃতি বুকের তলায় আজও যে তেমনি তাজা আছে কে জানত? কেন যাচ্ছি, কি জন্যে দেখতে যাচ্ছি? একদিন যেমন চেয়েছিলাম তেমনি করে কৃষ্ণকুমারের মৃত্যুর ছবিটা মর্মান্তিক করে তোলার অকরুণ লোভে?

না, সেই মেজাজ এখন আর নেই। আবার মন বলছে রওনা হয়েছি যখন যাওয়াই যাক না! সুলক্ষণার সঙ্গে দেখা যে হবেই তার কি মানে! জয়ন্ত রঙ্গর সঙ্গে আর তো দেখা হয়নি। সে যে ইচ্ছে। করেই ওকে নিজের বাড়ির হদিস দেয়নি বা আর এসে দেখাও করেনি, তাতেও আমার মনের তলায় বিস্ময়ের আঁচড় পড়েছে। প্রায়শ্চিত্তের তাগিদেই সে-যে হরিদ্বারে এসেছিল এই বা, কে জোর দিয়ে বলতে পারে? প্রদীপের নিচেটাই তো অন্ধকার। পুণ্যস্থানে এ-যাবৎ পাপের মিছিলও আমি কম দেখিনি। দেখা হলে হবে, নয়তো দিন দুই একটু বেড়িয়ে আবার ফেরা যাবে।

কিন্তু এও জানি, এ-সবই আমার নিজেকে ভোলানোর চিন্তা। নিজের বিবেক একটু পরিষ্কার রাখার তাড়না। নইলে ভিতরে ভিতরে ওকে দেখার একটু ইচ্ছে যে ছিলই সেটা মিথ্যে নয়।

হরিদ্বার আমার মোটামুটি চেনা জায়গা। চেনা বলতে বেড়াবার জায়গাগুলো আর স্নানের ঘাট-টাটগুলো চিনি। কিন্তু বাড়ির হদিস বা ঠিকানা জানা না থাকলেও সেখান থেকে এক রমণীকে খুঁজে বার করতে পারব এমন ভরসা ছিলই না। একটা হোটেলে আস্তানা নিয়েছিলাম। তারপর সকালে বিকেলে ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা হর-কী-পিয়ারীর ঘাটে হাজিরা দিচ্ছিলাম। প্রথম বিকেলটা কাটল, পরের দুটো দিনের সকাল বিকেলও কাটল। হর-কা-পিয়ারীর ঘাটে দুবেলা আমার দুটো চোখ অভদ্রের মতো মেয়েদের দিকে ধাওয়া করেছে। দেখা মিলল না। আর মিলবেও না ধরেই নিয়েছিলাম। কালকের দিনটা দেখে আবার দিল্লী ফেরার সঙ্কল্প। আমার বাইরেটা মোটামুটি নির্লিপ্ত। সুলক্ষণার দেখা না পেয়ে খুব হতাশ হয়েছি, নিজের কাছে সেটা স্বীকার করতেও সংকোচ। জায়গাটা ভালো। দেখা হলে আরো ভালো হত। হল না যখন কি আর করা যাবে। দু-বেলা ওই হর-কী-পিয়ারীর ঘাটও একটা দেখার জায়গা, বেড়ানোর জায়গা। দুপুরের রোদ চড়া না থাকলে এখানে তিন-চার মাইল হেঁটে বেড়ানোর মধ্যেও আনন্দ আছে।

দেখা হল। পরদিন নয়, এই বিকেলেই। ঘণ্টাখানেক ঘাটে পায়চারি করার পর নেমে সোজা একদিকে পা চালিয়ে দিয়েছিলাম। সেটা কোন দিক আমি

জানি না। রাস্তটা নির্জন। ফাঁকায় ফাঁকায় এক-একটা ডেরা। হঠাৎ এক জায়গায় এসে পা দুটো মাটির সঙ্গে যেন আটকে গেল।

যে জায়গার কথা বলছি, ঘাট থেকে কম করে মাইল তিনেক দূরে। এখানে। সন্ধ্যা নামে দেরিতে। সবে তখন বিকেলের আলোয় টান ধরেছে। চারদিকে বাঁশের বেড়া দেওয়া ছোট একটা আঙিনা। তার এক প্রান্তে একটা টালির দালান। তার সামনের প্রাঙ্গণে ঘাসের ওপর বসে আছে পাঁচ-ছটি রমণী। নিজেদের মধ্যে গল্প করছে, কেউ কেউ হাসছে। ঠিক তাদের পিছনেই দাওয়ার ওপর যে বসে, তাকেই আমি খুঁজছি, তার জন্যেই দিল্লী থেকে এখানে আসা।

বেড়ার বাইরে কোনো পুরুষ যদি দাঁড়িয়ে গিয়ে গুটিকতক মেয়েকে দেখতে থাকে, সেটা চোখে পড়তে সময় লাগে না বোধহয়। ঘাসের ওপর যারা বসেছিল, তাদের বয়েস অনুমান বাইশ-চব্বিশ থেকে চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশের মধ্যে। আর এখান থেকে অন্তত সকলকেই বেশ সুশ্রী মনে হল আমার। তারাই প্রথম দেখেছে আমাকে। কারণ আমি যাকে দেখছি তার হাতে একখানা বই কি বাঁধানো খাতা বোঝা যাচ্ছিল না। তার দৃষ্টি সেদিকেই।

মেয়েগুলো নিজেদের মধ্যে হয়তো বলাবলি করল কিছু। আগেও হাসছিল। আমাকে দেখার পরের হাসিটা ভিন্ন বিষয়গত কিনা জানি না। দুই-একটি বয়স্কার বেশ বিরক্ত মুখও দেখলাম। তাদেরই একজন মুখ ফিরিয়ে পিছনের দাওয়ায় বসা রমণীটিকে বলল হয়তো কিছু। কারণ বই বা খাতা থেকে তার দৃষ্টিটা এই বাঁশের ফটকের দিকে ঘুরল।

ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, মনে হল স্থির নিশ্চল কয়েক মুহূর্ত। তারপর উঠল। তারপর বেশ ধীরেসুস্থে এদিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

আমি চেয়েই আছি। জয়ন্ত রঙ্গ খুব বাড়িয়ে বলেনি। সামান্য মোটার দিক ঘেঁষলেও শ্রী যেন আগের থেকেও বেড়েছে।..এক পিঠ খোলা চুল। তেলের সঙ্গে যোগ কম বলেই হয়তো লালচে দেখাচ্ছে একটু। গায়ের রংও আগের থেকে ফর্সাই মনে হয়। পরনে চওড়া হলদে ছাপা পাড়ের পাতলা সাদা শাড়ি। গায়ে মুগো রঙের ব্লাউস। হাতে কিছু কাঁচের চুড়ি।

...সেই সুলক্ষণা দয়াল এখন তাহলে এই। আসতে আসতে একবারও আমার দিক থেকে চোখ ফেরায়নি সে। আমিও না। ঠোঁটের ফাঁকে সামান্য হাসি চোখেও। আগের মতো তীক্ষ্ণ নয় আদৌ। উল্টে কৌতুকমাখা।

সামনে এলো। দেখল আর একবার। হাসল আবার একটু। দড়ি বাঁধা গেটটা খুলে দিয়ে ডাকল, এসো।

বাইশ বছর নয়, যেন কিছুদিন আগেই আমাকে দেখেছে সে। আজ আবার দেখল। এখন ভিতরে ডাকছে।

স্থান কাল ভুলে আমি ওর দিকেই চেয়ে আছি। ওকেই দেখছি। সবার আগে আমার মগজে যে চিন্তাটা ঘা দিয়েছে, নিজের অগোচরে এরই মধ্যে হয়তো তার জবাবও খুঁজছি। বিগত বাইশটা বছরের মধ্যে এই মেয়ের কতগুলো বছর পুরুষের অশুচি বাসনার সহচরী হয়ে কেটেছে জানি না। এখনো যেমনটি দেখছি, পুরুষের চোখে না পড়ার মতো নয়– ডাক পড়ে কিনা জানি না। কিন্তু কোনো ব্যভিচারিণী মেয়ের চোখে মুখে হাসিতে এই প্রসন্নতা লেগে থাকে কি করে?

–কি হল, এসো? ওই মেয়েগুলো ভাবছে কি?

ভিতরে এলাম। তারপর পাশে পাশে টালি ঘরগুলোর দিকে এগোলাম। সুলক্ষণা হালকা হেসে বলল, তোমার সঙ্গে শীগগিরই একদিন দেখা হয়ে যাবে আমি ঠিক জানতাম।

–কি করে

–বাঃ তোমার সঙ্গে জয়ন্তর দেখা হয়নি?

মাথা নাড়লাম।–হয়েছে। কলকাতায়।

–সে তোমাকে আমার কথা বলেনি?

-বলেছে। বলেছে, হর-কী-পিয়ারীর ঘাটে হঠাৎ সুলক্ষণার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। কে সুলক্ষণা আমি হঠাৎ বুঝতেই পারিনি।

ঘাড় ফিরিয়ে ভূ-ভঙ্গি করে তাকালো মুখের দিকে।-বা-ব্বাঃ, তাহলে তুমি মস্ত একজনই হয়েছ বটে। তারপর কি করে বুঝলে?

–ও যখন বলল, ঝুমরির সঙ্গে দেখা হয়েছে।

ইচ্ছে করেই আমাদের চলার গতি শিথিল। আবার সেই হাসিমাখা ভূ-ভঙ্গি।–ওই মেয়েদের সামনে তুমি আবার আমাকে ঝরি-টুমরি ডেকে বোসো না যেন! ওদের কাছে আমি সুলক্ষণাদিদি।

আমি ওর মুখের দিকে তাকালাম শুধু একবার। ও আবার ঘাড় ফিরিয়ে ফিক করে হেসে নিল একটু।–কি দেখলে? সুলক্ষণা ডাকার মতো কিছু চোখে পড়ছে না বুঝি?

মনে মনে বললাম, সবটাই সুলক্ষণা দেখছি–আর সেই জন্যেই অবাক লাগছে। মুখে বললাম, আমার সঙ্গে শীগগিরই দেখা হবে ভাবলে কি করে, জয়ন্তর মুখে তোমার কথা শুনে কলকাতা থেকে ছুটে আসব ধরে নিয়েছিলে?

মাথা নেড়ে সুলক্ষণা জবাব দিল, অত ভাগ্যি ভাবিনি, তবে এদিকে এলে একবার খোঁজটোজ করবে আশা ছিল।

বললাম, তাই বা করব ভাবলে কি করে, জয়ন্তকে তো নিজের বাড়ির হদিস দাওনি। হর-কী-পিয়ারীর ঘাটে আবার দেখা হবে বলেও আর সেদিক মাড়াওনি। দেখা হতে পারে ভেবে আমিও ওই ঘাটে দুদিন দুবেলা করে হাজিরা দিয়েছি। কাল ফিরব, আজ হঠাৎ দেখা হয়ে গেল।

ঘাড় ফিরিয়ে দু চোখ বড় বড় করে তাকালো সুলক্ষণা। সেই চোখে হাসি উপচে পড়ছে। মুখে বিড়ম্বনার ছোঁয়া।–কি কাণ্ড! আমারই পোড়া কপাল, ইস, দু-দুটো দিন এ-ভাবে পণ্ড হয়ে গেল!…জয়ন্তর কাছে শুনে সত্যিই কি কলকাতা থেকে চলে এসেছ নাকি?

–না, দিল্লী থেকে, দিল্লীতে কাজে এসেছিলাম। একটু শ্লেষের লোভ সামলানো গেল না, বললাম, তা হঠাৎ জয়ন্তকে ওভাবে কাটতে দিলে কেন-লজ্জায় ভয়ে?

হাসতে লাগল। ওই মেয়েদের কাছে পৌঁছনোর আগে একটু সময় নেবার জন্যেই হয়তো সামনের বাগান ঘুরে চলেছে। যেখানে ফুল বেশি ফুটে আছে, সেখানে দাঁড়াচ্ছেও দুই-এক মিনিট করে। হাসিমুখে সাদা-সাপটা জবাবও দিল। বলল, কাটান দিলাম, কারণ জয়ন্ত এখনো সেই আগের জয়ন্তই আছে মনে হল, আর আমি কেমন। মেয়ে জানে বলেই কথার ফাঁকে ফাঁকে আমার মুখ থেকে পা পর্যন্ত খুঁটিয়ে দেখে নিতেও ছাড়েনি–আর, বাড়ির সন্ধান পেলে ওর হয়তো দুই-এক রাত আমার কাছে কাটিয়ে যেতেও আপত্তি হত না।

শোনার সঙ্গে সঙ্গে ঘৃণায় ভিতরটা রি-রি করে উঠল আমার। এই কথাগুলো এমন অনায়াস কৌতুকে বলতে পারল বলেই রাগ। দাঁড়িয়ে গেলাম। বললাম, দেখা তো হল, আজ চলি তাহলে?

দাঁড়িয়ে গিয়ে থমকে তাকালো আমার দিকে। তারপর তেমনি পলকা রসিকতার সুরেই পাল্টা জবাব দিল, যাবে যাও–অত ভয় দেখাচ্ছ কি? তারপরেই হেসে বলল, তোমাকে জয়ন্ত ভাবছি না, এসো–

এর পরেও আঘাত দেবার ইচ্ছেটাই প্রবল আমার। বললাম, জয়ন্ত হলে বা জয়ন্ত ভাবলেই বা তোমার এমন কি সাংঘাতিক ক্ষতি আর আপত্তি?

আবারও দাঁড়িয়ে গেল। কয়েক পলকের জন্য সমস্ত মুখ লাল একটু। আমার মনে হল কালো চোখের তারায় সেই আগের মতো আবার এক ঝলক বিদ্যুতও ঝলসে উঠতে পারে। না, তা উঠল না, একটু দেখেই নিল শুধু। তারপর মুখ টিপে হেসে। বলল, এই বাইশ বছর বাদেও তোমার ভয়ানক রাগ দেখছি আমার ওপর। কেন গো?

এবারে নিজেরই কানের কাছটা গরম ঠেকছে। সুলক্ষণা বলল, চলে এসো, ওই মেয়েগুলো কি ভাবছে ঠিক নেই

তার সঙ্গ ধরে আবারও শ্লেষ মাখানো জবাব দিলাম, তোমার পুরনো কোনো প্রীতির পাত্র ভাবছে হয়তো।

হেসে ফেলল। মাথা দুলিয়ে জবাব দিল, তাহলে তো ঠিকই ভাবছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, ওই মেয়েরা কারা?

-আমার কাছেই থাকে, আর আমাকে খুব ভক্তিশ্রদ্ধা করে। বড় ভালো মেয়েগুলো। কিন্তু ওদের এক-একজনের কথা শুনলে তুমি হয়তো এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে সোজা কলকাতার গাড়িতে চেপে বসবে।

যা বোঝার এটুকু থেকেই বোঝা গেল।

আমরা সামনে আসতে মেয়েগুলো উঠে দাঁড়াল। তাদের ভক্তি-শ্রদ্ধার পাত্রটি অমন হাসিমুখে এতক্ষণ ধরে কার সঙ্গে আঙিনা পাড়ি দিল, তলায় তলায় হয়তো সেই কৌতূহলও আছে।

সুলক্ষণা বলল, এই মেয়েরা, কাকে দেখে তোরা হাসাহাসি করছিলি! কলকাতার একজন নামকরা লেখক। বামুন মানুষ, প্রণাম কর।

আমার অস্বস্তির একশেষ। ওরা একে একে পা ছুঁয়ে প্রণাম সারল। আমার দিকে চেয়ে সুলক্ষণা হেসে জিজ্ঞাসা করল, আমিও ঠুকব নাকি একটা?

গম্ভীর মুখে আমি আঙুল দিয়ে নিজের পা দেখিয়ে দিলাম। ও ছদ্ম কোপে ফোঁস করে উঠল, উঃ! বয়ে গেছে

আগন্তুক দেখে ভিতর থেকে আরো তিন-চারটি মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। খুব না হোক, এরাও মোটামুটি সুশ্রী। আর বয়েস বাইশ থেকে ছাব্বিশের মধ্যে। আমি বাঙালী লেখক পরিচয় পেলেও আমার সঙ্গে তাদের সুলক্ষণাদিদিটির সম্পর্ক কি এরা জানে না। আর সুলক্ষণারও আর বেশি

পরিচয় দেবার উৎসাহ দেখা গেল না। সকলের উদ্দেশেই সে বলল, চা কর, তোরাও খা আমাদেরও দে–এঁর জন্যে একটু খাবার-টাবারও করিস। আমাদের আজ বাইরে কোনো প্রোগ্রাম নেই তো?

ওরা মাথা নাড়ল। নেই।

–বাঁচা গেল। আমি এঁকে নিয়ে একটু ঘরে বসছি, সময় হলেই ডাকিস

কিসের সময় হলে কেন ডাকবে বোঝা গেল না। দিনের আলো এখন শেষ প্রায়। টালির ঘরগুলোতে আলো জ্বালা হয়েছে। একটি পরিচারিকা ঘরে ঘরে লণ্ঠন রেখে যাচ্ছে দেখলাম।

আমাকে নিয়ে সুলক্ষণা দাওয়ার সামনের ঘরটাতেই ঢুকে পড়ল। পাশাপাশি একই সাইজের চারটে ঘর। তারপর শেষের দিকে আর একটা বড় হলঘরের মতো। টালির ছাদ হলেও ঘরের মেঝে সিমেন্টের, আর ইট-সুরকির দেয়াল। পরিষ্কার তকতকে ঘর। দেয়ালে ঝোলানো ক্যালেণ্ডারে গোপালের মূর্তি। কোণের দিকে একটা নেয়ারের খাঁটিয়া পাতা। তাতে পরিচ্ছন্ন সাদাসিধে শয্যা বিছানো। আলনায় খান-দুই শাড়ি আর জামা ঝুলছে। এদিকের দেয়ালে একটা আয়না টাঙানো।

কোথাও এতটুকু আতিশয্য নেই। এ-রকম একটা ঘরে এসে দাঁড়ালে ভিতরটা আপনা থেকে খুশী হয়।

সুলক্ষণা জানালো, এটা তার ঘর। এতগুলো মেয়ের মধ্যে শুধু তারই একলার। একখানা ঘর। অন্য ঘরগুলোর এক- একটায় তিন-চারটে করে মেয়ে থাকে।

রসিকতা করে বললাম, প্রমীলারাজ্যে এসে গেলাম মনে হচ্ছে।

হেসে মাথা নেড়ে সুলক্ষণা, সায় দিল। বলল, সমস্ত বাড়িতে পুরুষও একজন আছেন–তিনি গোপাল। আর দ্বিতীয় পুরুষ তুমি এলে।

বললাম, গোপালের তাতে হিংসে হবে না?

–একটু হলেই বা, সেও তো খুব সুবিধের পুরুষ নয়। হাসিমুখে একটা আসন। টেনে নিয়েও থমকালো একটু, তারপর হেসে আসনটা আবার যথাস্থানে রাখতে রাখতে বলল, যাকগে, তুমি ওই বিছানাতেই বসো-গোপালের আর একটু বেশি হিংসে হোক!

আমিও ঠাট্টা করলাম, ঠাকুর দেবতার হিংসে কুড়িয়ে কাজ কি!

–আচ্ছা তুমি বসো তো, ঠাকুর দেবতা আমি মেয়েটা কেমন ভালো করেই চেনে।

শয্যার এক ধারে বসলাম। একটা ভাজ করা কম্বলের ওপর চাদর বিছানো। নিজেকে নিয়ে ও অনায়াসে যে ইঙ্গিত করল, সেটুকুর জন্যেই আমার বাইশ বছরের ক্রোধ আর পরিতাপ। অথচ আশ্চর্য, সব জানা থাকা সত্ত্বেও সুলক্ষণার দিকে চেয়ে আমার বার বার মনে হচ্ছিল, একটা শুচিতা যেন ওকে ঘিরে আছে।

ও সামনে এসে দাঁড়াল। চাউনিটা গভীর একটু।

–কি দেখছ?

–তোমাকে। সেই বাইশ বছর আগের মতোই কাঁচা কাঁচা লাগছে। বিয়ে করেছ শুনেছি–বউ কেমন?

হেসে জবাব দিলাম, বিয়ে তো সেই কোন যুগে করেছি–এখন আর কেমন-এর কি আছে?

চোখ পাকালো।–তার মানে বউ পুরনো হয়ে গেছে? হাসলও সঙ্গে সঙ্গে। –ছেলে মেয়ে পড়ছে?

মাথা নাড়লাম।

ও ছেলেমানুষের মতোই বলে উঠল, আমার ছুটে গিয়ে দেখে আসতে ইচ্ছে করছে!

–চলো না!

–ইস, কি পরিচয় দেবে?

–বলব, তোদের অদেখা অনেককাল আগের এক হারানো মাসি।

হেসে উঠে লঘু সুরে সুলক্ষণা বলল, কেন পিসী বলবে না?

বাইশ বছরের সঠিক ইতিবৃত্ত কিছুই জানি না। কিন্তু এটুকু সময়ের মধ্যেই আমার ভালো লাগছে, হালকা লাগছে। মাথা নাড়লাম, নাঃ, অতটা নীরস হতে পারব না।

সুলক্ষণা হাসছে। চেয়ে আছে। বললাম, বসো

তেমনি চেয়ে থেকেই রসিকতা করল, এক্ষুনি চা দিতে আসবে, তুমি ওখানে বসে আছ দেখেই অবাক হবে, পাশে আমাকে দেখলে তো কথাই নেই। সামনে দাঁড়িয়েই ভালো লাগছে। জয়ন্ত বলছিল, অনেক নাকি বই-টই লিখেছ?

–লিখেছি।

–কি বই?

–গল্প, উপন্যাস।

টিপ্পনীর সুরে একটু বিস্ময় প্রকাশ করল সুলক্ষণা, তোমার মধ্যে এত রস আছে জানতাম না।...দু-একখানা পাঠাও না, এককালে তো আমাকে বাংলা শেখানোর কি ঝোঁক ছিল তোমার–ঠেকে ঠেকে ঠিক পড়ে নিতে পারব।

–হিন্দী অনুবাদও আছে, তাই পাঠাব, ঠেকে ঠেকে পড়তে হবে না।

সুলক্ষণা ছেলেমানুষের মতোই খুশী হয়ে উঠল। মুখে বলল, তুমি এখান থেকে বেরিয়েই ভুলে যাবে। বাইশ বছরের মধ্যে একদিনও আমার কথা মনে পড়েছে?

–তোমার পড়েছে?

–আমার! হুঁ। তাহলে তো খুব উপন্যাস লেখো তুমি! কি মনে হতেই আবার হাসি-আমার গল্প লিখবে না?

বললাম, তুমি সদয় হলেই লিখতে পারি।

ছদ্ম ভয়ে দু চোখ বড় করে ফেলল একটু, সদয় হলে মানে? কি করতে হবে?

-মাঝের বাইশটা বছরের ফারাক জুড়তে হবে, অর্থাৎ বাইশ বছরের খবর সব বলতে হবে।

সুলক্ষণা বলল, না শুনেই তো ঘেন্নায় চলে যেতে চাইছিলে, শুনলে তো এ নাম আর মুখেও আনবে না–কলম ধরা তো দূরের কথা!

সেই বিরূপ অনুভূতিটা এরই মধ্যে নিঃশেষে মিলিয়ে গেল কি করে ভেবে পাচ্ছিলাম না। এখন থেকে থেকে কেন যেন কেবলই মনে হচ্ছে শোনার মতো অনেক কথা আছে, আর শুনলে পর কলমও ধরা যাবে। গম্ভীর বক্তৃতার সুরে বললাম, লেখক হিসেবে আমি ভালো-মন্দ সুন্দর-কুৎসিত সব দেখি আর শুনি, শেষে তাই থেকেই জীবন-সোনা ঝালিয়ে তুলি।

সুলক্ষণা তেমনি চোখ বড় বড় করে আমাকে দেখতে লাগল। তারপর বলল, ও বাবা। থাক, এটুকু শুনেই আমি ঘাবড়ে যাচ্ছি।

চায়ের ট্রে হাতে একটি মেয়ে ঘরে ঢুকল। দু পেয়ালা চা, একটা ডিশে কিছু ঘরের তৈরি খাবার। একটা কাগজ পেতে দিয়ে সেই ট্রেও শয্যার ওপরেই রাখতে বলল সুলক্ষণা। এটুকুও ব্যতিক্রম মনে হল আমার। কারণ, মেয়েটির মুখে বিস্ময়। মাখা সম্ভ্রম দেখলাম।

মেয়েটি চলে যেতে সুলক্ষণা ট্রে থেকে নিজের পেয়ালাটা শুধু তুলে নিল। বললাম, আর কিছু নেবে না?

নাঃ, তোমার খাতিরে চা খাচ্ছি, নইলে এ-সময় কিছুই চলে না। তুমি খাও

একটু বাদে হালকা সুরে জিজ্ঞাসা করল, জয়ন্ত আমার কথা আর কি বলেছে তোমাকে?

-বলেছে, বয়েস হলেও এখনো বেশ মাইরি, চোখ ফেরানো যায় না।

হাসতে গিয়ে চা আটকে বিষম খেল সুলক্ষণা। তারপর আধা-খাওয়া পেয়ালা ঘরের কোণে সরিয়ে রাখতে রাখতে হেসেই রাগ দেখালো, বরাবর ওটা পাজির পা-ঝাড়া একটা

আমি নরম প্রতিবাদ করলাম, কেন, খুব মিথ্যে তো বলেনি।

হ্যাঁ, চাইলে ওর চোখে বাইশ বছর আগের সেই হাসি এখনো ঝিলিক দিয়ে উঠতে পারে বটে। মুখে তরল ঝাঝালো সুরে বলল, দেখো, তুমি ওর সঙ্গে গলা মিলিও না বলছি।

খেতে খেতে নিরীহ প্রশ্ন ছুঁড়লাম, মেলালে ওর মতোই গলাধাক্কা দেবে?

ও মা, ওকে গলাধাক্কা কখন দিলাম!

বাড়ির হদিস দিলে না, আসবে বলে এলেও না–গলাধাক্কা আর কাকে বলে?

ও হাসতে লাগল। তারপর বলল, নাঃ, তোমার সঙ্গে ওর মতো ব্যবহার করব, হাজার হোক দুর্বলতা একদা ছিলই

-কার ছিল, তোমার না আমার?

-তুমি বড় জেরা করো। প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করল, এখানে কোথায় উঠেছ?

বললাম। একটু ভেবে নিয়ে সুলক্ষণা বলল, লোভ হলেও এখানে তোমাকে থাকতে বলতে পারছি না, জানলে কত জনের চোখ টাটাবে ঠিক নেই। তার

থেকে দুপুরে আর রাতে এখানে এসে খাবে–বেশি দূর নয়, টাঙায় মিনিট দশেক লাগে।

-আমি তো কালই দিল্লী চলে যাচ্ছি।

যেন আমার ওপর এখনো জোর আছে, এমনি করে সুলক্ষণা বলল, কাল তুমি মোটেই যাচ্ছ না।

আপত্তি নেই খুব, কারণ সুলক্ষণার জীবনের মাঝের এই বাইশটা বছর নিয়ে এখন দুর্বার কৌতূহল আমার। এতগুলো মেয়ের মধ্যে ওকে ঠিক এই পরিবেশে না দেখলে এত আগ্রহ হত না হয়তো।

একটু বাদেই ওদিক থেকে শাঁখের আওয়াজ কানে এলো। একটি মেয়ে সাঁঝের ধূপধুনো দিয়ে গেল। তারপরেই খোলকরতালের আওয়াজ শুনলাম। সুলক্ষণা আমাকে নিয়ে ঘর থেকে বেরুলো। শেষের বড় ঘরটায় এসে ঢুকলাম ওর সঙ্গে। সেখানে এ-মাথা ও-মাথা শতরঞ্জীর ওপর ফরাস পাতা। সেই ফরাসে এখন তিরিশ-চল্লিশটি মেয়েছেলে বসে। বেশির ভাগই বয়স্কা আর বিধবা। ঘরের এক মাথায় মালা গলায় বেশ বড়সড় গোপাল মূর্তি। তার সামনে হারমোনিয়াম, তবলা, খোল করতাল। সেখানে এখানকার অর্থাৎ এই ডেরার মেয়েরা বসে। তাদের সামনে বেশ সুন্দর একটা আসন পাতা।

আমাকে সামনের দিকে বসিয়ে সুলক্ষণা এগিয়ে গিয়ে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে গোপাল প্রণাম করল। কম করে তিন-চার মিনিট মাথা ঠেকিয়ে পড়ে রইল সে। তারপর উঠে আস্তে আস্তে সেই খালি আসনটায় গিয়ে বসল।

গান শুরু হল। একটানা ভজন গান। মূল গায়িকা সুলক্ষণা। অন্য মেয়েরাও থেকে থেকে সুর মেলাচ্ছে, সুলক্ষণা থামলে তারা সেই বিরতিটুকু ভরাট করে রাখছে। প্রায় ঘণ্টাখানেক চলল এই গান। না, এরকম গান আমি খুব বেশি শুনিনি। গলা বরাবরই মিষ্টি ছিল সুলক্ষণার। সেই গলা কত যে ভালো হয়েছে আরো, কানে না শুনলে বিশ্বাস হত না। কিন্তু এই গানের গলা আর

সুরই যেন সব নয়, সমষ্টিগত সত্তার নিবিড় যোগ না থাকলে এমন গান হয় না, এ-রকম পরিবেশ সৃষ্টি হয় না।

বাইরের মহিলারা সব উঠে উঠে গোপাল প্রণাম করে টাকা আধুলি সিকিটা ফেলে চলে যেতে লাগলেন।

আমি উঠে পায়ে পায়ে আবার সুলক্ষণার ঘরে এসে বসলাম। বাইশ বছর আগের সুলক্ষণার সঙ্গে একে যেন কিছুতে মেলাতে পারছিলাম না।

মিনিট পনের বাদে সুলক্ষণা ঘরে এলো। চোখে মুখের সেই তন্ময় ভাবটুকু গেছে। হালকা সুরেই জিজ্ঞাসা করল, কেমন লাগল?

-বেশ।

ঠিক এইটুকু জবাব আশা করেনি হয়তো। মুখের দিকে চেয়ে রইল। ভিতরটা আমার হঠাৎই আবার কেন যে অসহিষ্ণু হয়ে উঠল জানি না। হয়তো, সুলক্ষণার বাইশ বছর আগের ঘর ছাড়া, আর এই গোপাল চরণে আত্মসমর্পণ–এর কোনোটার সঙ্গেই আপোস নেই আমার।

বললাম, সবটুকুই ভক্তি না এর সঙ্গে জীবিকার যোগও আছে?

থমকে তাকালো মুখের দিকে। মনে হল বেদনার ছায়াও পড়ল একটু। জবাব দিল, জীবিকার ব্যবস্থা না থাকলে ভক্তি আসবে কোত্থেকে?

-কিন্তু এই দিয়েই তোমাদের এতগুলো মেয়ের দিন চলে যায়?

হয়তো এই প্রশ্নে তির্যক কটাক্ষ ছিল একটু। কিন্তু সুলক্ষণা দয়ালের একটা পরিবর্তন স্পষ্ট। আগের মতো সহজে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে না, ঝলসে ওঠে না, হয়তো বা অনেক নিগ্রহের পরে এই সংযমটুকু আয়ত্ত করেছে। যাক, আমার কথার জবাবে ও যা বলল, সেও অবাক হবার মতোই। সপ্তাহে কম করে তিন-চারদিন বাইরের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে গানের প্রোগ্রাম থাকে তাদের। হরিদ্বারে কোথাও না কোথাও সে রকম অনুষ্ঠান লেগেই আছে। সবার আগে তাদেরই ডাক পড়ে। সুলক্ষণাদের বিশেষ কিছু দাবিদাওয়া নেই, যারা

যেমন দেয়। এখন নাম হয়েছে বলে খুব কমও দেয় না কেউ। এমন কি হরিদ্বারের বাইরেও বহু জায়গায় গাইতে যেতে হয়। দিন বেশ ভালোই। চলে যায় তাদের, অভাব-টভাব নেই।

জিজ্ঞাসা করলাম, এই গানের দল তুমি কতদিন গড়েছ?

একটু ভেবে নিয়ে ও বলল, তা প্রায় বছর নয় হবে।

এবারে আমি সত্যিই অবাক একটু। নবছর আগে হলে তখন তেত্রিশ চৌত্রিশ হবে ওর বয়েস। এখন যা দেখছি, সে-সময় নিশ্চয় ওর ভরা যৌবন, ভরা রূপ। সব ছেড়ে সেই সময় থেকে ও গোপাল আশ্রয় করেছে–এটা স্বাভাবিক ব্যাপার নয় আদৌ। আমি চেয়ে আছি, ওর মুখ থেকেই সেই অস্বাভাবিক ব্যাপারটা টেনে বার করতে চেষ্টা করছি। শেষে বলেই ফেললাম, ও-বয়সে এ-রকম তো হবার কথা নয়, গোপাল এমন টানা টানলে, কি ব্যাপার?

মুখের দিকে চেয়ে টিপটিপ হাসতে লাগল। তারপর বলল, গোপাল টানলে এমনিই হয়।...তখন ভর-ভরতি অবস্থা আমার, পায়ে করে পুরুষের মন মাড়িয়ে যেতেই আনন্দ, তারই মধ্যে কি কাণ্ড–একেবারে চুলের মুঠি ধরে টেনে এনে নিজের পায়ে মুখটা আচ্ছা করে ঘষে দিয়ে তবে ছাড়লে–ছাড়লেই বা বলছি কেন, এখনো এই দুষ্টুমিই চলছে।

শুনতে ভালো লাগছে, কিন্তু কিছুই বোঝা গেল না। আমি চেয়েই আছি।

আত্মস্থ হয়ে সুলক্ষণা বলল, অত ব্যস্ত কেন, সব শোনাব বলেই তো ধরে রেখেছি। রোসো, নিজের ভিতরটা আরো ভালো করে খুঁজে দেখে নিই আগে

হেঁয়ালির মতো লাগল। ভিতরের তাগিদ সত্ত্বেও আর জোর করলাম না। কি মনে হতে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার এই মেয়েদের পেলে কোথায়?

www.bengaliebook.com

নিঃসঙ্কোচে সুলক্ষণা দয়াল জবাব দিল, নিজে থেকেই এসেছে, আগে মাত্র একটি চেনা মেয়ে ছিল, এখন ওরা নজন।...সবই আমার মতো, কেউ নিজে ভুল করেছে, কাউকে বা জোর করে ভুল করানো হয়েছে।

জিজ্ঞেস করলাম, ওদেরও ভিতর-বার এখন গোপালের পায়ে?–

হেসে ফেলল।তাই যাতে হয় আমি তো চেষ্টা করি, আর নেবার আগে যতটা পারি যাচাই বাছাই করে নিই। তবু গণ্ডগোল কি হয় না, এ-পর্যন্ত দু-দুটো মেয়ে ফের আবার লোভে পড়ে এখান থেকে সরে গেছে–আর তোমাদের পুরুষের লোভও বলিহারি, ঠাকুরঘরে থাকো আর যেখানেই থাকো, জাল ফেলার কামাই নেই, পুণ্যিস্থানে। যেন আরো বেশি পাপের বাসা।

সুলক্ষণার সঙ্গে দেখা হবার পরেও চার দিন চার রাত হরিদ্বারে ছিলাম। বলতে গেলে দু বেলাই ওদের এখানে এসেছি। বাড়ির বাইরে দুদিন গানের প্রোগ্রাম ছিল সেখানে ও গেছি। এখানকার মেয়েরা আমাকে শুভার্থী আত্মায় ভেবেছে। সুলক্ষণা তাদের কি বলেছে জানি না, কিন্তু আমার প্রতি তাদেরও কোনো রকম পলকা কৌতূহল। দেখিনি। উল্টে অবিমিশ্র শ্রদ্ধাই দেখেছি।

ফাঁকে ফাঁকে অনেক কথা হয়েছে সুলক্ষণার সঙ্গে, কিন্তু একটি বারও সে এর মধ্যে কৃষ্ণকুমারের বা তাদের বাড়ির কারো নামও উচ্চারণ করেনি। ক্রমে আমারই ধৈর্য কমে আসছিল। ফঁক পেলেই তাগিদ দিচ্ছি, বলবে বলেও তো কিছুই বললে না–এবার যেতে হচ্ছে আমাকে।

গতকালও বলেছিলাম। ভ্রূ কুঁচকে আমার দিকে একটু চেয়ে থেকে ঝাঁঝ দেখিয়েছে, আমি কি তোমাকে ধরে রেখেছি?

বলেছিলাম, তা অবশ্য রাখোনি–

তেমনি করেই ও আবার বলেছিল, পুরুষের স্বভাবই ওই রকম, এতবড় দেবস্থানে। এসেও নরকের কথা শোনার লোভ।

আমি হেসেই জবাব দিয়েছিলাম, নরকের কথা তো নয়, নরক থেকে ওঠার। কথা। সেটা শোনার মধ্যে পুণ্যি আছে।

–ছাই আছে। ওঠা তো ভারি, এই যে তুমি চলে যাবেই, তোমার বাড়ি-ঘর স্ত্রী ছেলেমেয়ে আছে–অথচ তোমাকে সত্যি ধরে রাখতে ইচ্ছে করছে।

দু কান ভরে শোনার মতো কথা, একটু চুপ করে থেকে বলেছিলাম, করলেই বা, এ ইচ্ছের মধ্যে তো নরক নেই।

..ওর চোখেমুখে যে সুন্দর হাসিটুকু দেখেছিলাম তাও ভোলার নয়।

আজ সকালে আবার বললাম, কাল সকালে আর না গেলেই নয়, কাজের খুব ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে–রিজারভেশান পেলে সোজা এখান থেকে কলকাতাই চলে যাব।

সুলক্ষণা বলল, ঠিক আছে, নাম-গানের দৌলতে আমার একটু চেনা-জানা আছে, একেবারে অসম্ভব না হলে রিজারভেশান পেয়ে যাবে।

সন্ধ্যেয় রিজারভেশানের টিকিট আমার হাতে তুলে দিয়ে বলল, নিশ্চিন্ত?

আমিও হেসেই মাথা নাড়লাম।

এই রাতটুকুই প্রত্যাশা আমার। ছিলামও রাত প্রায় সাড়ে দশটা পর্যন্ত। কিন্তু এ-দিন দেখলাম একলা পাওয়াই ভার ওকে। মেয়েদের নিয়ে ব্যস্ত, আমার খাওয়ার ব্যাপারে ব্যস্ত। কাল ট্রেনে আমার সঙ্গে কি কি খাবার যাবে–মেয়েদের সেই নির্দেশও দিচ্ছে।

রাতে হোটেলে ফেরার মুখে ওকে কাছে দেখলাম না। একটি মেয়ে বলল, দিদি এইমাত্র তার ঘরে গেলেন–

পায়ে পায়ে তার ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে ভিতরে এসে দাঁড়ালাম। স্টীলের বাক্স খুলে ওদিক ফিরে কিছু একটা করছে ও।

ঝুমরি...।

চমকে ফিরে তাকালো। তারপর হেসেই ফেলল। বলল, বাইশ বছর বাদে এ ডাক শুনে ভয়ানক চমকে গেছলাম।

চললে?

–হ্যাঁ।

এগিয়ে এলো। হাসছে তখনো।–ঠিক আছে। তোমার খাবার নিয়ে সকালে ঠিক সময়ে আমি স্টেশনে যাবখন।

এসেছে। একলাই। ট্রেন ছাড়তে তখন আর মিনিট দশেক মাত্র বাকি। খাবারের পাত্রটা জায়গা মতো রেখে এ-দিক ওদিক তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, জল কোথায়?

–আছে। বসো তুমি। আমি ভাবলাম আর এলেই না।

কুপেতে তখন পর্যন্ত আমি একা। আমার হাতখানেক তফাতে বসে সুলক্ষণা বলল, তোমাদের তো ওই রকমই ভাবনার দৌড়।..কলকাতায় পৌঁছে চিঠি দেবে তো?

–চিঠি দিলে জবাব পাব?

হাসিমুখেই মাথা নাড়ল, তা অবশ্য পাবে না। আচ্ছা তোমাকেও চিঠি লিখতে হবে না, দেখা হল, এই ভালো। গোপালের দয়ায় নিরাপদে পৌঁছুবে জানিই তো।

ঘড়ি দেখলাম। আর পাঁচ মিনিট মাত্র বাকি। অভিমানহত সুরে বললাম, আমারই শেষ পর্যন্ত কিছু জানা হল না।

-হবে, হবে। হাতের ঝোলা খুলে বাদামী রংয়ের বড় খাম বার করল একটা।-তুমিও যেমন, এ-সব কথা মুখে বলা যায় নাকি! খামটা হাতে দেবার আগে থমকালো একবার।–কিন্তু একটা কথা, আমাকে নিয়ে কোথায়ও কিছু লিখবে না!

–কেন?

লিখলে তুমি ঠিক আমাকে বাড়াবে জানি। সব কবুল করতে পেরে আমার মনে একটু শান্তি এলো–ব্যস, এর বেশি আর কিছু চাই নে। রাস্তায় যেতে যেতে পড়বে, তারপর ছিঁড়ে কুচি কুচি করে জানলা দিয়ে ফেলে দেবে। ঠিক তো?

হাত বাড়িয়ে ওর হাত থেকে খামটা নিলাম। বললাম, সেটা না পড়া পর্যন্ত বলতে পারছি না–তবে বাড়াবো না, কথা দিলাম।

ঘড়ি ধরে গাড়ি ছেড়েছে। তার আগে সুলক্ষণা নেমে জানলার কাছে দাঁড়িয়েছে। চলন্ত ট্রেন থেকে যে কয়েক সেকেন্ড দেখা গেছে তাকে, দেখেছি। তারপর খাম খুলে বসেছি।

কথার খেলাপ করব না। বাড়ানোর ভয় আছে বলেই, সুলক্ষণা দয়াল যা লিখেছে। সেটুকুই শুধু তুলে ধরছি।

বাঙালীবাবু রাতে যাবার আগে তুমি ঝুমরি বলে ডাকলে, আমারও বাইশ বছর আগের প্রিয় নামে তোমাকে ডাকার সুবিধে হয়ে গেল। আমার মেয়েদের কাছে এ. কদিন তোমাকে বাঙালীবাবুই বলেছি, আর আমার নিজেরই দু কান যেন ভরে গেছে।

তোমার অনেক জানতে চাওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু বড় নোংরা ব্যাপার সব। সাধকরা বলেন, পাপ ধুয়ে ফেলতে চাও তো পাপ স্বীকার করো। কিন্তু কার কাছে স্বীকার করব? ঘরের দেওয়ালের কাছে? তোমাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তোমার জানার লোভ থেকে আমার জানানোর লোভটা কম ছিল না। কিন্তু দোহাই তোমার, সবটুকু পড়ার আগেই ঘেন্নায় ছিঁড়ে ফেলে দিও না।

..জীবনে প্রথম যে মানুষকে দেখলে আমার দুচোখ ঘৃণায় ঠিকরতো, আর মাথায় খুন চাপতো, সে আমার বাবা। একদিন আমি এই বাবাকেই দুনিয়ার সেরা সুন্দর পুরুষ ভাবতাম। বাবা যখন গান-বাজনা নিয়ে বসত, আমি

চেয়ে চেয়ে দেখতাম আর ভাবতাম ওরকম গানের আসরে কবে আমারও জায়গা হবে।

বাবা মদ খেত তাও আমার কাছে খুব একটা দোষের কিছু নয়। মা রাগ করত, আর আমি ভাবতাম মা-ই ইচ্ছে করে ঝগড়া বাধায়। আমার পনের বছর বয়সের সময় মায়ের শরীর একেবারেই ভেঙে গেল। চড়া ডায়বেটিস। উঠতে বসতে মাথা। ঘোরে। একদিন বাথরুমে মাথা ঘুরে পড়ে গেল। তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। বাড়িতে কেউ নেই, উর্বশ্বাসে আমি ছুটলাম দুর্গা মাসির বাড়ি। বাবা সেখানে আড্ডা দিতে যায়। এই দুর্গা মাসির সম্পর্কেও পাড়ার লোকে ভালো বলে না। দুর্গা মাসির কেন বিয়েই হল না, তাই নিয়েও এক-একজন এক-এক রকম বলে। কিন্তু ও-সবেও আমি কান দিই না। কারণ দুর্গা মাসি হাসে খুব, আমি গেলে আদর করে কাছে টেনে নেয়। ভালো ভালো খেতে দেয়।

বাড়ি থেকে পনের মিনিটের হাঁটা পথ এক ছুটে চলে এসেছি। বেদম হাঁপাচ্ছি। কিন্তু দুর্গা মাসির বাড়ি এসে মনে হল, কেউ নেই। দুটো ঘরই অন্ধকার। সামনের ঘরের দরজা খোলা, পিছনের অর্থাৎ দুর্গা মাসির ঘরের দরজা ভেজানো। ঠেলতেই দরজা খুলে গেল। ভিতরে ঢুকে আলো জ্বালোম।

তারপরে কয়েক পলকের জন্য যেন পাথর আমি। কি দেখলাম তা আর বলে কাজ নেই। ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলাম আবার। আরো দ্বিগুণ ছুটে সোজা বাড়ি। এর মধ্যে বিকেলের ঠিকে ঝিটা এসেছিল। মাকে ওই অবস্থায় দেখে সেই পাড়ার লোক ডাকাডাকি করে তাকে ঘরে এনেছে।

আমি সে-ঘরেও আর থাকতে পারলাম না। বাইরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে ঠকঠক করে কাঁপছি। সমস্ত পৃথিবীটা আমার কাছে একটা দগদগে ঘায়ের মতো বীভৎস লাগছে।

মিনিট কুড়ির মধ্যে বাবা এলো। এসেই আমার গালে প্রচণ্ড একটা চড় বসিয়ে দিল। এমন চড় যে আমি ঘুরে পড়ে গেলাম।

মা আর সে-যাত্রা রক্ষা পেল না। তার তিন মাসের মধ্যে বিয়ে করে বাবা দুর্গা মাসিকে ঘরে নিয়ে এলো। দুর্গা মাসি গোড়ায় গোড়ায় আমার মন পেতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাকে দেখলেই আমার দুচোখে গলগল করে ঘৃণা ঠিকরতো। ফলে বাবা আমাকে শাসন করত। তার ফলও উল্টো হত।

ভালবাসা ঠিক কাকে যে বলে আমি তখনো জানি না। শুনলে তুমি কানে আঙুল দেবে কিনা জানি না, আমার জীবনে প্রথম ভালবাসার মানুষ কৃষ্ণদাদা। ওই কাজিন বিয়ে না কি বলে, আমাদের সমাজে সেটা চালু থাকলে যে করে তোক কৃষ্ণদাকে নিয়ে আমি পালাতাম, প্রাণ দিয়ে চিকিৎসা করতাম, তাকে ভালো করে তুলতাম। কৃষ্ণদাদার ঝাঁঝরা বুকের সঙ্গে নিজের বুকটা বদলাবদলি করা সম্ভব হলে তাও করতাম বোধহয়। আমার ভালবাসা কৃষ্ণদাকে শুধু সুস্থ করে তুলতে চেয়েছে, আর কিছু না। এই ভালবাসা কি পাপ?

কিন্তু এখানেও নিজের বাবার মতোই একজনকে আমি ঘৃণা করতে শুরু করলাম। সে কৃষ্ণকুমারের বাবা। আমার পিসেমশাই। তার সেই বড় আদরের বন্ধু যজ্ঞেশ্বরবাবুকে নিশ্চয় মনে আছে তোমার? বয়সে পিসেমশাইয়ের থেকে পাঁচ-ছ বছরের ছোট, পিসেমশাইকে দাদা-দাদ করত। পয়সাঅলা মানুষ, আমি এলাহাবাদে আসার আগেই তার বউ মরেছে শুনেছিলাম। তখন উনিশ পেরিয়ে সবে কুড়িতে পা দিয়েছি আমি, বোনকে একদিন আমাকে দেখাতে নিয়ে এলো যজ্ঞেশ্বরবাবু। ওই বোনের ছেলে মস্ত সরকারী চাকুরে, তার বিয়ে দেওয়া হবে। ভালো মেয়ে চাই। দাবিদাওয়া নেই। পিসেমশাই আর পিসির অনুরোধ ঠেলতে না পেরে যজ্ঞেশ্বরবাবু বোনকে নিয়ে এলো মেয়ে দেখাতে। মানে আমাকে দেখাতে। আমি জোর করে বলতে পারি সেই বোনের আমাকে পছন্দ হয়েছিল। নানাভাবে আমাকে যাচাই করে দেখে আর গান শুনে খুশীতে আটখানা হয়ে চলে গেছল। কিন্তু পরে গম্ভীরমুখে পিসেমশাই এসে খবর দিল তার নাকি মেয়ে পছন্দ হয়নি।

পছন্দ না হওয়ার কারণটা দুদিন না যেতেই বেশ বোঝা গেল। সন্ধ্যায় পিসেমশাই কেমন যেন চুপিচুপি এক জায়গায় যেতে হবে বলে আমাকে

ধরে নিয়ে গেল। রাস্তায়। বলল, যজ্ঞেশ্বরের শরীরটা ভালো না, তোর গান শোনার ইচ্ছে হয়েছে, তাই

তখনো সাদা মনেই গেছি আমি। বিরাট চক-মিলানো দালান। যজ্ঞেশ্বরবাবুর ঐশ্বর্যের কথা বলতে বলতে পিসেমশাই আমাকে তার কাছে নিয়ে গেল। যজ্ঞেশ্বরবাবুর ছেলে তিনটে কাছাকাছিই ছিল, বড় ছেলেটা আমার থেকে বড় হবে বয়সে–সে আমাকে চোখ দিয়ে গিলতে গিলতে আর একদিকে চলে গেল।

যজ্ঞেশ্বরবাবুকে একটুও অসুস্থ মনে হল না আমার। দিব্যি হাসিখুশি ফুর্তির মেজাজ। আমাকে আর পিসেমশাইকে একরাশ খেতে দিল। তারপর গান নিয়ে বসলাম। গাইতে গাইতে ওই লোকটার সঙ্গে বার কয়েক চোখাচোখি হতেই আমার মনে হল কিছু একটা গোলমেলে ব্যাপারের মধ্যে পড়তে চলেছি। গান একটুও ভালো হল না। কিন্তু যজ্ঞেশ্বরবাবু প্রশংসায় পঞ্চমুখ। একে একে অনেকগুলো গান গাইয়ে ছাড়লে।

ফেরার সময় পিসেমশাই আমাকে খোলাখুলি যা বলল, তার সার কথাযজ্ঞেশ্বরের মতো অত ভালো লোক আর হয় না, যেমন পয়সা তেমনি দরাজ মন। বয়েস একটু হয়েছে, তাও পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশের মধ্যে– ব্যাটাছেলের সেটা এমন কিছু বয়েস নয়। তার খুব পছন্দ তোকে, রানীর হালে থাকবি-মাথা ঠাণ্ডা করে ওকেই বিয়েটা করে ফেলা উচিত।

শোনার পর সর্বাঙ্গ রি-রি করে উঠল আমার। জবাব না দিয়ে আমি শুধু মাথা নাড়লাম। অর্থাৎ তা হবে না।

তাইতেই পিসেমশাই রেগে উঠল। আমার অবাধ্য হবি? আমি তোর ভালো বুঝি না?

আমাকে চুপ দেখে একরকম শাসিয়েই দিল তারপর। যা হবার পরে ভেবে চিন্তে হবে, কিন্তু এ নিয়ে যেন বাড়ির কাউকে একটি কথাও না বলি।

তার ভয় কৃষ্ণদাদাকে। কিন্তু তাকেও কিছু বলতে পারা গেল না। বললে কতবড় অশান্তির সৃষ্টি হত জানি। আর তখন কৃষ্ণদার যা শরীরের হাল।

কদিন না যেতে পিসেমশাই আবার আর একদিন যজ্ঞেশ্বরবাবুর বাড়ি নিয়ে যেতে চাইল। আমি গেলাম না। পিসেমশাই রাগে ফুঁসতে লাগল। এর একদিন পরেই যজ্ঞেশ্বরবাবু বাড়ি এসে হাজির। পিসেমশাইও ঘটা করে তার আদর আপ্যায়ন করল। তারপর আমার ডাক পড়লো, গান শোনাতে হবে। কৃষ্ণদাই আমাকে ঠেলে পাঠালো, ভদ্রলোক এসেছেন বাড়ি বয়ে, গান শোনাবি না তো গান শিখিস কেন?

এক ঘণ্টা ধরে গান হল। আর সেই এক ঘণ্টা ধরে দুই চোখ দিয়ে আমার শরীরটা যেন চেটেপুটে খেল যজ্ঞেশ্বরবাবু। চলে যাবার পর পিসেমশাই আমাকে তার ঘরে ডেকে নিয়ে প্রায় শাসিয়েই দিল, আমার অবাধ্যপনা বরদাস্ত করা হবে না, দুদিন আগে হোক পরে হোক বিয়ে ওখানেই হবে। তোর পিসিকেও আমি বুঝিয়ে শুনিয়ে রাজী করিয়েছি–এর থেকে ভালো যে আর কিছু হয় না সেটা সেও বুঝেছে। আর তার শেষ কথা, ছেলে এখন অসুস্থ, তাকে যেন এখন এসব কথা শুনিয়ে একটুও বিরক্ত না করা হয়। আমাকে প্রস্তুত থাকতে হবে এটুকুই তার নির্দেশ।

আমি চারদিকে তখন অন্ধকার দেখছি। এর ওপর পরদিনই আবার কৃষ্ণদার গলগল করে রক্ত পড়ল গলা দিয়ে। আমার মনে হল কৃষ্ণদা দশ-বিশ দিনের মধ্যেই চলে যাবে। তারপর? ওই পিসেমশাই আর ওই যজ্ঞেশ্বরের হাত থেকে কে আমাকে রক্ষা করবে? বিশ্বাস করো বাঙালীবাবু, আমার তখন প্রথমেই তোমার কথা মনে হয়েছিল। তোমাকে ভালো লাগে, বাঁচার তাগিদে তোমাকে নিয়ে পালাতে আমার একটুও আপত্তি হত না। আর সেভাবে আঁকড়ে ধরতে পারলে তুমিও আমাকে ছাড়তে পারতে না। কিন্তু তারপরেই মনে হল, তোমার অন্য রকম সমাজ, অন্য রকম পরিবার। আমার প্রতি তোমার একটু দুর্বলতা আছে বলে এমন একটা শাস্তি তোমার ওপর চাপিয়ে দেব! নিজের সমাজ, সংসার থেকে বঞ্চিত হয়ে একদিন তুমিই কি আমাকে ঘৃণা করবে না?

তোমাকেও বাতিল করে দিলাম। তখন থাকল আর একজন। তার খবর তোমরা কেউ রাখো না। তার নাম কিশোর শেঠ। যে ওস্তাদের কাছে আমি গান শিখতাম, তারই আর এক শিষ্য। মাখনখানার মতো চেহারা। দুহাতের পাঁচ আঙুলে পাঁচটা আংটি ঝকমক করত। জামায়ও হীরের বোতাম পরত। নিজের ঝকমকে একখানা গাড়ি হাঁকিয়ে আসত সে। আমার সপ্তাহে যে দুদিন গান শেখার পালা, তার সেদিন আসার কথাও নয়। কিন্তু দু-চারবার দেখা হয়ে যাওয়ার পর ক্রমে দেখা গেল ওই দু-দিনই সে সব থেকে নিয়ম করে আসত। গুরুর কাছে আসবে, তালিম দেওয়া শুনবে–তাতে আর কার কি বলার আছে। তাছাড়া ওই ওস্তাদের মতো ভালো মানুষও কম হয়।

কিশোর শেঠ কেন যে আসত আমিই শুধু ভালো বুঝতাম। এক-একদিন গাড়ি নিয়ে সে একটু দূরে অপেক্ষা করত। আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে চাইত। আমি তার সঙ্গে কথা বলতাম না, চোখ দিয়ে চাবকে অন্য দিকে ফিরে চলে আসতাম।

কলেজ যাবার সময়ও এক-একদিন তার গাড়ি আমার পাশে এসে দাঁড়িয়ে যেত। গাড়িতে আমাকে কলেজে পৌঁছে দেবার জন্য অনুনয়ই করত। আমি ঝাঁঝিয়ে উঠতাম, ফের এ-ভাবে আমার পিছু নিলে মুশকিল হবে। কিশোর শেঠ হাসত, বলত, তুমি নারাজ, এর থেকে মুশকিল আর কি হতে পারে?

বড়লোক শিষ্যকে গুরু যে একটু বেশি খাতির করতেন সে আমার নিজের চোখেই দেখা। সেখানে বলে কিছু সুবিধে হবে না। বাড়িতে কৃষ্ণদার এই হাল। মাঝখান থেকে লোক জানাজানি হয়ে একটা বিচ্ছিরি কাণ্ড হবে। আমি রাগে ফুলতাম, কিন্তু সহ্যও করতে হত। লোকটারও মুণ্ডু যে ভালোভাবেই ঘুরেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। গুরুর বাড়ির আর কলেজ যাওয়ার পথ যে আকুতি নিয়ে গাড়িতে বসে থাকত, তাই দেখে সময় সময় হাসিও পেত। আমাকে একটু চোখের দেখা দেখতে পেলেও যেন জীবন ধন্য ওর।

আমার সেই সংকটের সময় ওর কথাই মনে এলো আমার। সঙ্গে সঙ্গে একটা ভাঙচুরের নেশা যেন পেয়ে বসল আমাকে। এই করলে বাবার ওপর শোধ নেওয়া হবে, পিসেমশাইয়ের ওপরেও।

সেদিনও কলেজের পথে কিশোর শেঠের গাড়ি দাঁড়িয়ে দেখলাম। সোজা এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে তার পাশে বসলাম। এ-রকম ভাগ্য ওর কল্পনার বাইরে। আনন্দে ডগমগ হয়ে জিজ্ঞাসা করল, কলেজে তো?

-না। যেখানে খুশি।

হাওয়ায় ভেসে চলল কিশোর শেঠের গাড়ি। আমি সোজা ঘুরে বসলাম তার দিকে। জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি ঠিক ঠিক কি চাও বলো?

ও বলল, তোমাকে।

–বিয়ে করবে?

দম বন্ধ করে ও মাথা ঝাঁকিয়ে জবাব দিল, করব।

–তোমাদের বাড়িতে আপত্তি হবে না?

মুখ কাচুমাচু করে ও বলল, তা একটু হবে হয়তো…।

-তাহলে?

— ও প্রাণপণে এই তাহলের জবাব হাতড়ে বেড়াতে লাগল। আমিই রাস্তা দেখালাম, আমাকে নিয়ে পালিয়ে যেতে পারবে?

ও লাফিয়ে উঠল। তক্ষুনি রাজী। আমি বললাম, আজ নয়, সময়ে বলব। বাড়িতে বলে রেখো কিছুদিনের জন্য বাইরে যাচ্ছ, নইলে তোমার বাড়ি থেকেও আবার। খোঁজাখুঁজি শুরু হবে। আর বেশ কিছুদিন চলার মতো টাকাকড়ি সঙ্গে নিও।

অত বলার দরকার ছিল না। ব্যবস্থামতো আমরা চলে এলাম বেনারসে। এক নাগাড়ে কোথাও বেশিদিন থাকতাম না। ইউ পি-র সর্বত্র প্রায় মাসখানেক ঘোরাঘুরি করে কাটল। কিশোর শেঠ আমার কেনা গোলাম যেন। যা বলি তাই শোনে। আমার একটু সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আর আনন্দের জন্য দেদার খরচ করে। ওকে যতটুকু পাগল করা দরকার করেছি। বিকেল হতে না হতে রাতের প্রত্যাশায় বসে থাকত। কিন্তু বিয়ের কথা তুললেই ওর মুখ ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে হয়ে যেত। বলত, হবে, খুব শীগগিরই হবে, তুমি অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন?

আমার সন্দেহ বাড়তে থাকল। শেষে জেরার ফলে একদিন ধরা পড়ে গেল। দু-বছর আগেই ওর বিয়ে হয়ে গেছে। ঘরে বউ আছে। হাঁটু গেড়ে আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরে ওর সে-কি আকুতি। বিয়ে করলেও আমিই ওর ধ্যান জ্ঞান, আমিই সব। বিয়ে ও আমাকে ঠিকই করবে, কিন্তু তার আগে সব দিক গুছিয়ে নেবার জন্য ওর কিছু সময় দরকার।

আমার মাথায় আকাশ ভেঙেছে। ওর বুকে একটা ধারালো ছোরা বসিয়ে দিতে পারলে মন ঠাণ্ডা হত। সেই রাতে আমার শয্যার দিকে ওকে ঘেঁষতে দিলাম না। সমস্ত রাত বসে ভাবলাম। একদিন ওই কিশোর শেঠ আমাকে ছেড়ে চলে যাবে ঠিক জানি। কিন্তু তার আগে ওকে অবলম্বন করেই আমাকে দাঁড়াতে হবে, ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা দূর করতে হবে। এটুকু যদি না পারি, আমার রূপ যৌবন চোখের আগুন। সব মিথ্যা।

পরদিনই আবার ওকে কাছে টেনে নিলাম। খুব হাসলাম। খুব আদর করলাম। বললাম, তুমি এত ছেলেমানুষ আমি জানতাম না, প্রথমেই সব আমাকে খুলে বললে পারতে–সত্যিকারের ভালবাসার মানুষকে ওটুকুর জন্যে কেউ কি ফেলে দিতে পারে, না কি সত্যিকারের ভালবাসা সমাজসংসারের পরোয়া করে?

কিশোর শেঠ বর্তে গেল।

আমি আরো নিশ্চিন্ত করে দিলাম তাকে। বললাম, যাকগে, বিয়ের ভাবনা আর তোমাকে ভাবতে হবে না, আমি তোমার প্রেয়সী হয়েই থাকব–কিন্তু

তুমি আমাকে তোমার রুচির যোগ্য করে তোলো, এই যৌবনের ফুল শুধু তোমার জন্যেই যেন সম্পূর্ণ হয়ে ফুটতে পারে সেই ব্যবস্থা করো।

ব্যবস্থাটা কি প্রথমে বোঝেনি, পরে বোঝার পর আনন্দে আত্মহারা হয়েছে। হবে না কেন, টাকার তো অঢেল জোর। ওকে নিয়ে আমি লক্ষ্ণৌ চলে এসেছি। সেখানে অনেক খরচ করে গুণী ওস্তাদ রেখে আবার গান বাজনার তালিম নিতে শুরু করেছি। নাচও বাদ দিইনি। নামী বাঈজীর কাছে সহবৎ শিক্ষা করেছি। না, বোকার মতো কিশোর শেঠকে আমি সেখানে আটকে রাখিনি। সে তারই ইচ্ছে মতো বাড়িতে গেছে,এসেছে। যখনই এসেছে দু পকেট বোঝাই টাকা এনেছে। আমি অম্লান বদনে সে-টাকা নিজের দখলে রেখেছি, আর প্রতি বারের থেকে প্রত্যেক বারে বেশি প্রেমের অভিনয় করেছি। ওকে পাগল করাটাই আমার লক্ষ্য। পাগল করেছি।

খুব বেশি সময় লাগেনি। গলা তো অনেকটা তৈরিই ছিল, বছর চারেকের মধ্যেই আমাকে নিয়ে টানাটানি পড়তে লাগল। আমার রূপ যৌবন কটাক্ষ সবই কাজ করত, ফলে টাকাও বেশি পেতাম। নাচ গান তো আছেই, আরো প্রত্যাশায় টাকার মানুষেরা। পায়ে এসে গড়াগড়ি খেত। প্রাপ্যগণ্ডা মনের মতো হলে তাদেরও করুণা করতে আমার আপত্তি হত না। আমার ভিতরে সেই থেকেই শুধু ধ্বংসের আগুন জ্বলছে। সেই আগুনে নিজেকে পোড়ানো আর মত্ত উল্লাসে পুরুষ পোড়ানোই একমাত্র লক্ষ্য। সে-সময়ে যদি তোমার দেখা পেতাম বাঙালীবাবু, তাহলে তোমারও কি সর্বনাশ যে হত কে জানে। কৃষ্ণদা অনেক আগেই মারা গেছে সে-খবর কিশোর শেঠ আমাকে এনে দিয়েছিল। আমার কাছে দুনিয়ার বাকি সব পুরুষ নরকের জীব। তারা যত বেশি জ্বলবে আমার তত উল্লাস।

এর পর আমার প্রথম কাজ কিশোর শেঠকে ছিবড়ের মতো বাতিল করা। আমার আশা ছেড়ে তাকেও একদিন জ্বলতে জ্বলতে ঘরে ফিরতে হয়েছে। আমার ব্যাঙ্কের জমা টাকা বাড়ছেই, অলঙ্কারের ঐশ্বর্যও বাড়ছেই। পুরনো হয়ে যাবার ভয়ে খুব বেশিদিন কাউকে আমি এক নাগাড়ে ধরে রাখি না। ফলে নতুন নতুন মানুষের ধর্ণা দেওয়া আর মাথা খোঁড়ারও বিরাম নেই।

এবারে নিশ্চয় ঘৃণায় শিউরে উঠছ বাঙালীবাবু। আরো একটু বাকি–শোনো। তখন। আমার বয়েস বত্রিশ পেরিয়েছে। অর্থাৎ এলাহাবাদ ছাড়ার পর তের-চোদ্দ বছর কেটে গেছে। কিন্তু পুরুষ তুখনো আমাকে নিয়ে এমনি মত্ত যে বয়েস দেখার চোখ কারো। নেই। এদিক-থেকে ভুগর্বানের কিছু মাত্র কার্পণ্য ছিল না বলে বয়েস চোখে পড়ার কারণও নেই। সেবারে এক ধনীর দুলালের সঙ্গে এসেছি মধ্যপ্রদেশের কোনো এক জায়গায়। টাকার অঙ্ক সে-রকম হলে তাতেই বা আপত্তি কি? এ-রকম কত সময়। কত জায়গায় গেছি, ঠিক নেই।

জঙ্গলের মধ্যেই মাঝারি আকারের একটা ডাক-বাংলো। ফুর্তির জায়গা হিসেবে। আমার সঙ্গী সেই বাংলোটাই বেছে নিয়েছে। বাংলোয় আমি আর সে ছাড়া আর যে লোকটার অবস্থান, মানুষ না বলে তাকে জানোয়ারই বলা চলে। বছর সাঁইতিরিশ আটতিরিশ হয়তো বয়েস, পা থেকে গলা পর্যন্ত গরম কম্বল জড়ানো, মাথার চুল পিছন দিকে পিঠে এসে নেমেছে, আর গাল বোঝাই দাড়ি বুকের দিকে। গায়ের আর চুল দাড়ির রং মিলেমিশে একাকার। এখানে আসার পর এমনি হাঁ করে আমার দিকে তাকিয়েছিল যেন জীবনে আর কখনো মেয়েছেলে দেখেনি। আমার সঙ্গী ধমকে উঠতে তবে সে আত্মস্থ হয়েছে।

লোকটা এই বাংলোর চৌকিদার।

আমরা বিকেলের দিকে এসেছি। দিন দুই থাকার ইচ্ছে। সন্ধ্যা নামতেই সঙ্গী মদের গেলাস নিয়ে বসেছে। ওরা যত মদ গেলে আমার তত সুবিধে। হামলা হুজ্জোত কম। হয়। ওকে সঙ্গ দেবার জন্য আমিও গেলাস নিয়ে বসেছি। আর খাচ্ছিও একটু বেশিই। সেই সঙ্গে গুনগুন করে রসের গানও গেয়ে উঠছি। এক-একবার উঠে নাচার চেষ্টাও করছি।

রাত তখন নটা-দশটার বেশি নয়। কিন্তু এখানে তখন নিঝুম রাত। খাওয়াদাওয়ার পরে আবার এক-প্রস্থ মদ গিলল লোকটা। তারপর আমার দিকে এগলো। ঘরে সবুজ আলো জ্বলছে। আমার ঘুম পাচ্ছে। কতক্ষণে অব্যাহতি পাব ভাবছি।

হঠাৎ ঠাস করে ঘরের ভেজানো দরজা দুটো খুলে গেল। কেউ যেন প্রচণ্ড এক লাথি মেরে দরজা খুলে ফেলল। ঘরে এসে দাঁড়াল যমদূতের মতো সেই চৌকিদার। জন্তুর মতোই জ্বলছে তার দুটো চোখ। গায়ের কম্বল ফেলে এগিয়ে এসে আমার বুকের ওপর থেকে সঙ্গীকে যেন ছোঁ মেরে টেনে তুলে নিয়েই এক আছাড়। লোকটা আর্তনাদ করে উঠল। আমি কাঠ। যমদূতের মতো ওই চৌকিদার আবারও এগিয়ে গেল তার দিকে, আবারও টেনে শূন্যে তুলে নিল। তারপর তাকে নিয়ে চোখের পলকে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আমি কাঁপছি থরথর করে। কি চায় লোকটা? কি মতলব ওর? একে একে দুজনকেই খুন করবে আমাদের?

একটু বাদেই মোটর স্টার্ট দেবার শব্দ কানে এলো। কি হল? আমাকে রেখে সঙ্গীকে গাড়িসুদ্ধ তাড়িয়ে দিল। ওই শীতেও আমি ঘামছি। শয্যায় উঠে বসে কাঁপছি।

সাক্ষাৎ যমের মতো ওই চৌকিদার ফিরল আবার। আমার দু হাতের মধ্যে দাঁড়িয়ে মুখের দিকে অপলক চেয়ে রইল। এখন আর ওই দুটো চোখ জানোয়ারের মতো জ্বলছে না। তার বদলে গলগল করে যেন ঘৃণা ঠিকরোচ্ছে। সেই ঘৃণা আমার চোখে মুখে ঝাপটা মেরে যাচ্ছে।

কিন্তু এরকম অপলক চাউনি আমি আর কি দেখেছি? কার দেখেছি? কবে দেখেছি? কোথায় দেখেছি? এ কাকে দেখছি আমি? আমার সামনে দাঁড়িয়ে এ কে?

লোকটা নিজের মোটা ময়লা জামার পকেটে হাত ঢোকালো। কি যেন বার করল। তারপর সেটা আমার সামনে, সজোরে আমার বিছানার ওপর আছড়ে ফেলল।

জিনিসটা চিকচিক করে উঠল। দু চোখ বিস্ফারিত করে আমি দেখলাম একটা হার। আমার মায়ের দেওয়া সেই চুরি যাওয়া হার।

মুখ তুলে দেখলাম, লোকটা ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

এবারে চিনলাম। সেই মধু। সেই মধু যাদব।

তার পর থেকে বাঙালীবাবু, তুমি যা দেখলে আমি তাই। এক বছর বাদে। মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলের সেই বাংলোয় আর একবার গেছলাম মধুর খোঁজে। সে নেই। কোথায় গেছে কেউ জানে না। আমি এখনো গান গাই আর গোপাল পুজো করি। আমার গোপালের মুখ আর মধুর মুখ আজও মাঝে মাঝে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। সেও কি পাপ?

আমি জানি না।

সোনালী রেখা

আত্মীয়-পরিজন সকলেই জানল রুচিরা জিতেছে। আনন্দে ডগমগ হবার মতো হারজিতের খেলা নয় এটা। এই হারজিতের ওপর স্বস্তি নির্ভর করছিল। শান্তি নির্ভর করছিল। তাই আনন্দে আটখানা না হোক, রুচিরা জেতার ফলে সকলে খুশী। সকলে বলতে একান্ত শুভার্থী জনেরা। বাবা-মা। দাদা-দিদি। নইলে খবরটা জানাজানি হবার। পর মুখ মচকাবে এমনও অনেকে আছে। রুচিরা ফিরে আবার গাঙ্গুলী হয়েছে এটুকুই তার জিত।

এতদিন ছিল রুচিরা ব্যানার্জী। মিসেস ব্যানার্জী। এখন এই দুপুরের পর থেকে আর মিস মিসেস কিছুই নয়। শুধু রুচিরা গাঙ্গুলী। সাতাশ মাসের একটা দুঃস্বপ্নের। শেষ। এই সাতাশ মাসের মধ্যে পনেরো মাস হাতে নোয়া বা শাখা ছিল না। কপালে। বা সিঁথিতে সিঁদুরও ছিল না। তবু অক্টোপাসের মতো দুটো ক্‌রুর লোলুপ হাতের অধিকার যেন ওকে আষ্টেপৃষ্ঠে আঁকড়ে ছিল।

সেই দুটো হাত পুরুষের। শক্ত সবল পুরুষ তাকে বলবে না রুচিরা। গোড়ায়। সেই রকমই বুঝেছিল। সেই রকমই ভেবেছিল। স্বয়ং ইন্দ্রের মতোই মাথা উঁচু মনে হয়েছিল ইন্দ্র ব্যানার্জীর। তার দর্প দেখে তার দম্ভ দেখে তখন শুধু পুরুষকারের ছটাই বড় হয়ে উঠেছিল রুচিরার চোখে। তার সঙ্গে বিয়ের যখন সব ঠিক তখনো সেই লোকের ছোটখাটো দুই-একটা অপরাধের নজির সামনে এনে বিয়ে বরবাদ করতে চেয়েছে কেউ কেউ।

বাবা-মা শুনে চিন্তায় পড়েছিলেন। দাদা-বউদি দিদি-জামাইবাবু থমকে ছিল।

চাঁদে কলঙ্ক নেই, গোলাপে কাটা নেই–এ কি হয়? কোকিল কালো নয়–এ কি হয়? সোনায় কিছু খাদ না মিশলে তা দিয়ে গয়না হয়? ইন্দ্র ব্যানার্জীর চরিত্রের যেটুকু আভাস পেয়ে বাড়ির সকলে ধাক্কা খেয়েছিল, রুচিরার চোখে পুরুষ প্রবৃত্তির একটা বেপরোয়া দিক মাত্র সেটা। লোকটার মধ্যে লুকোচুরির ব্যাপার নেই, পায়ে কোনো ভয়ের বেড়ি নেই। থাকলে সব-কিছু একটা ম্যাড়মেড়ে ব্যাপার হয়ে যেত। তাহলে সুশীতল চক্রবর্তীর সঙ্গে তার কোনো তফাত থাকত না। হায়ার সেকেন্ডারি থেকে এম. এ. পর্যন্ত নামকরা ভাল ছাত্র সুশীতল চক্রবর্তী। বি. এ-তে ফিলসফিতে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। এম, এ-তেও তাই। পা থেকে মাথা পর্যন্ত ভাল ছেলে। পান-সিগারেট পর্যন্ত খায় না। চোখে পুরু চশমা। তার ও-ধারের একটু ছোট চোখ দুটো বুদ্ধিতে চিকচিক করে। জোর-জুলুম কাকে বলে জানে না। মিষ্টি মিষ্টি হাসে। সকলে ভেবেছিল, এত ভাল ছেলে আই. এ. এস-এ বসবে। আর বসলে যে পাঁচজনের একজন হবে জানা কথাই।

কিন্তু বসল না। কারণটা রুচিরাকেই কেবল বলেছিল সুশীতল চক্রবর্তী। চোখের যা পাওয়ার তাতে বাতিল হয়ে যাবার সম্ভাবনা ষোলআনা। এই দোষ চাপা দিতে হলে অনেক কারচুপির দরকার। তার মধ্যে সে নেই। তাছাড়া ও-সব লাইন ভালও লাগে না। দু-দুটো ভাল কলেজ থেকে অফার এসেছে। কলেজের মাইনে-পত্র আজকাল খারাপ নয় খুব। একটা নিয়ে নেবে। আরো পড়াশুনা করার ইচ্ছে। সুযোগ হলে ডক্টরেট করে নিয়ে কিছু বই-পত্র লেখার ইচ্ছে।

এই লোক রুচিরার জীবনে সেধে এগিয়ে আসতে চেয়েছিল। বিনয়দার নিজের ছোট মাসতুতো ভাই সুশীতল চক্রবর্তী। বিনয়দা হল দিদির বর। বিলেত-ফেরত এঞ্জিনীয়ার। এক প্রাইভেট এঞ্জিনীয়ারিং ফার্মে মস্ত চাকরি করে বিনয়দা। স্বামীকে নিয়ে দিদির ভিতরে ভিতরে বেশ গর্ব আছে। এই বিনয়দার সুবাদে সুশীতল চক্রবর্তীর এ-বাড়িতে অল্প-স্বল্প আসা-যাওয়া ছিল। রুচিরার থেকে তিন ক্লাস ওপরে পড়ত।

www.bengaliebook.com

এই বিদ্বান মাসতুতো ভাইটিকে বিনয়দা ভালবাসে খুব। আর দিদি তার থেকেও বেশি। দিদি বয়সে বোধহয় ওর থেকে বছর দেড়েকের বড় হবে। কিন্তু কাছে পেলে রসিকতার ছলে দিদি একেবারে বাচ্চা ছেলের মতো আদর করত ওকে। একবার তো রুচিরা আর বিনয়দার সামনেই কি কারণে খুশী হয়ে দিদি আচমকা ওর দু-গালে দুটো চুমু খেয়ে বসেছিল। সুশীতল চক্রবর্তীর মুখখানা দেখতে তখন হেসে গড়াবার মতই হয়েছিল।

রুচিরা যখন হায়ার সেকেন্ডারিতে মোটামুটি ভাল রেজাল্ট করে ফিলসফি অনার্সে তিন বছরের কোর্সে বি. এ. পড়তে ঢুকল, সুশীতল চক্রবর্তী তখন এম. এ. ফাস্ট ইয়ার। দর্শনশাস্ত্রের সেতু ধরে তার পর থেকে দুজনের মধ্যে দর্শনের ব্যাপারটা আরো অনেক সহজ আর স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। রুচিরার যেবার বি. এ. পার্ট টু ফাইনাল পরীক্ষা, তার আগের বছর এম. এ. পরীক্ষা দিয়ে সুশীতল চক্রবর্তী সোনার মুখ করে যুনিভার্সিটি থেকে বেরিয়েছে। আর সেই অবকাশের অনেকখানি রুচিরাকে সাহায্য করার ব্যাপারে ঢেলে দিয়েছে। মাত্র চারটি নম্বরের জন্য বি. এ-তে ফাস্ট ক্লাস না পেয়ে সেকেন্ড ক্লাস ফার্স্ট হয়েছিল রুচিরা। এও তার কাছে এমন কি বাড়ির সকলের কাছেও আশাতীত। ফার্স্ট ক্লাস না পাওয়ার খেদ শুধু ওই সুশীতলের।

বেজায় খুশী হয়ে দিদি বলেছিল, এবারে পায়ে হাত দিয়ে তোর মাস্টারকে প্রণাম কর একটা, আর প্রার্থনা কর এম. এ-তে ফার্স্ট ক্লাস পাস।

আজকালকার কলেজে-পড়া ছেলে-মেয়েদের রীতি অনুযায়ী সুশীতলকে নাম ধরে অর্থাৎ বাড়ির সকলের মত শীতল বলেই ডাকত রুচিরা। দিদি এই জন্যেও কম মন্দ বলত না ওকে। শুনলেই চোখ পাকিয়ে ধমক লাগাত।এই! বড় না তোর থেকে?

দিদি এমন কিছু সেকেলে মেয়ে নয়, মাত্র সাড়ে চার পাঁচ বছরের বড় রুচিরার থেকে। তার সময়েও কলেজের সমবয়সী বা একটু আধটু বয়েসের ফারাকের ছেলেমেয়েদের নাম ধরে ডাকাডাকির রীতি ছিল। কিন্তু নিজের আদরের ওই মাসতুতো দেওরটির বেলায় দিদির গোঁড়ামি।

প্রণাম করার হুকুম শুনে বেশ মজার কাণ্ডই করেছিল রুচিরা। চট করে গম্ভীর হয়ে ভারী গলায় ডেকে বসেছিল, শীতল এদিকে আয়

না, একেবারে আধুনিকাদের মতো তুই কখনো বলেনি। তুমি করে বলত। এই ডাক শুনে তো দিদির চক্ষু কপালে। সে ভাবল হয়তো মাঝের এই তিন বছরে বোনের এই উন্নতি। সুশীতল কিন্তু মিটিমিটি হাসছিল। জিজ্ঞাসা করেছিল, কেন?

–দিদি বলল, শুনলি না? আয় প্রণাম করি

সুশীতল তার পরেও ভালমানুষের মতো এগিয়ে আসতে ধাক্কা মেরে তাকে দিদির। গায়ের ওপর ঠেলে ফেলে দিয়েছিল। প্রণাম সত্যি করবে দিদি আশা করেনি, কিন্তু ওই তুই-তোকারি শুনে রেগেই গেছল। দিদির মনের তলায় তখনো কি আশা রুচিরা বুঝতে পারেনি।

বি. এ. পরীক্ষার সময় সপ্তাহে কম করে চার পাঁচদিন তাকে পড়াতে আসত। সুশীতল। এম.এ-তে ঢোকার গোড়া থেকেই সেই রকমই আসতে লাগল। মুখে। কোনো দিন এতটুকু আভাস ব্যক্ত না করলেও তারপর থেকে কেন যেন একটু অস্বস্তি বোধ করছিল রুচিরা। জল হোক ঝড় হোক সে ঠিক আসবে। এসে যে কোনো রকম বাজে কথায়. সময় কাটাত তা নয়। তখন আবার কলেজের নতুন মাস্টার সুশীতল। উৎসাহ বা উদ্দীপনার অভাব নেই। গোড়া থেকেই নিয়ম করে পড়াশোনার তাগিদও দিত। কিন্তু ইদানীং ওর এম. এ-তে ভাল রেজাল্টই লক্ষ্য লোকটার, ভাবা যাচ্ছিল না। যা ভাবছিল, সেই গোছের ব্যাপার অনেক সময় চোখে-মুখে লেখা হয়ে যায়। রুচিরার ধারণা, সে সেটা নির্ভুল পড়ে নিতে পারছিল। একদিন তাই সরাসরি বলে ফেলেছিল, গোড়া থেকেই এত লেখাপড়া। আমার পোষাবে না বাপু, এ বছরটা অন্তত আগের মত সপ্তাহে দুদিনের বেশি পড়ছি না, পরীক্ষা এলে তারপর দেখা যাবে। বেশি পড়লে মাথা ঝিম ঝিম করে।

পুরু লেন্সের ওধারের চোখ দুটো তার মুখের ওপর থমকেছিল একটু।–মাত্র দুদিন?

-হ্যাঁ। দুদিন তোমার কাছে পড়ব, দুদিন আবার গানে লেগে যাব ভাবছি, আর দুদিন নিজে পড়ব–এমনিতেই তো দিদি কথা শোনায় আমার বি. এ-র রেজাল্টের পিছনে সবটাই তোমার বাহাদুরি।

মুখের দিকে তেমনি চেয়ে ছিল সুশীতল। যদি ফিরে জিজ্ঞাসা করত বাহাদুরিটা সে অস্বীকার করে কিনা, রুচিরা তেমন যুৎসই জবাব কিছু দিয়ে উঠতে পারত না। কিন্তু সে-রকম দাবি জাহির করার মানুষ সুশীতল চক্রবর্তী নয়। তাছাড়া সেকেন্ড ক্লাস ফাস্ট হওয়াটা তার কাছে কোনো ভাল রেজাল্টই না।

কথামতো সপ্তাহে দুদিন করেই আসছিল এর পর। কিন্তু মুখে যাই বলুক, একটু ভাল রেজাল্ট করার তাগিদ রুচিরার ভিতরে ভিতরে ছিলই। আর সেটা যে সবটাই, সুশীতল চক্রবর্তীর ওপর নির্ভর, তাও স্বীকার না করে উপায় নেই। ফাইনাল ইয়ারে পা দিয়েই সুশীতলের আসাটা দুদিনের জায়গায় এবার তিন দিন করে দেবে কিনা, আপনা থেকেই ভাবছিল।

এরই মধ্যে যা ভাবেনি, এক সন্ধ্যায় তাই হয়ে গেল। পড়ানোর মতো মুখ করেই সুশীতল বলল, অনেকদিন ধরে একটা কথা তোমাকে বলি-বলি করে বলা হচ্ছিল না। বউদিকে, মানে তোমার দিদিকে বলেছিলাম, উনি আবার আমাকেই ঠেলে দিলেন। কথা আর কিছু নয়, তোমার বাবা মা-কে এবারে যদি আমি একটা বিয়ের প্রস্তাব দিই, তোমার তাতে আপত্তি হবে কি না।

এমন মুখ করে বলল, যেন বাজারের আলু-পটল কেনার মতো সাদামাটা প্রস্তাব একটা। কিন্তু তাই শুনেই রুচিরা বিষম চমকে উঠল। অতর্কিতে আক্রান্ত হবার মতো মুখ।–বাবা-মায়ের কাছে বিয়ের প্রস্তাব …ইয়ে, মানে আমাকে বিয়ে?

পুরু লেন্সের ওধারের দুচোখে হাসির ছোঁয়া লাগল।তা না হলে আর তোমার আপত্তি হবে কিনা জিগেস করব কেন?

ভিতরে ভিতরে হাঁসাস দশা রুচিরার।–আমি, মানে, আমি কখনো কিছু এ নিয়ে ভাবিইনি-

–ভাবতে অসুবিধে হচ্ছে?

এমন সঙ্কটে রুচিরা বোধহয় জীবনে আর পড়েনি। ভিতরে ভিতরে নিদির ওপরেই আচ্ছা রাগ হতে থাকল। দিদির মারফত প্রস্তাবটা এলে যা বলার বলে দেওয়া সহজ হত, অন্তত চক্ষুলজ্জার বালাই থাকত না। এবারে জবাব দিতে সময় নিল একটু। তারপর যতটা সম্ভব নরম করে বলল, দেখ, তুমি খুব ভাল, আর তোমাকে আমার ভালও লাগে–কিন্তু এ-রকম চিন্তা আমার কখনো মাথায় আসেনি বা সেভাবে তোমাকে কক্ষনো দেখিনি

রুচিরার দেখার ভুল নয়। চোখের হাসি মিলিয়ে গেছে। না, এই জবাব আশা করেনি। উল্টে বোধহয় ধরেই নিয়েছিল রুচিরার চোখেমুখে সম্মতির খুশীর ছটা দেখবে। তার দিকেই চেয়ে আছে তখনো। বিস্ময়-আশাহত চাউনি। না বুঝে-শুনে দিদি একে কতখানি আশা দিয়ে বসেছিল কে জানে।

বিড়ম্বনা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা মানুষটার। গলার স্বরও এবারে ঠাণ্ডা একটু।–সে ভাবে দেখেছ এমন কেউ এসে গেছে?

প্রাণের দায়ে এবারে সোজাসুজি মাথা নাড়ল রুচিরা। অর্থাৎ তাই। এসে গেছে। খুব সত্যি নয়। আবার একেবারে যে মিথ্যে তাও নয়। ইন্দ্র ব্যানার্জী তখন পর্যন্ত ওর মনের দরজা ভেঙে হুড়মুড় করে একেবারে ভিতরে ঢুকে পড়েনি। তবু এর কাছে স্পষ্ট মনোভাবটাই প্রকাশ করল রুচিরা। এসেই গেছে। একেবারে কেউ না এলেও এই মিথ্যের আশ্রয় নিত কিনা জানে না।

সুশীতল চক্রবর্তীর মুখে আবার বিস্ময়ের আঁচড় পড়ছিল।–তোমার দিদিরও এটা জানা নেই নিশ্চয়?

মরীয়া হয়েই জবাব দিল রুচিরা–দিদি কেন, এখন পর্যন্ত কেউ জানে না। প্লীজ, তুমিও আর দয়া করে জানতে চেও না।

সত্যিই ঠাণ্ডা আর ভদ্র এই মানুষটা। এ নিয়ে আর একটি কথাও বলেনি। আর কিছু জিজ্ঞাসা করেনি। খানিকটা আত্মস্থ হয়ে উল্টে বলেছিল, কিছু মনে করো না…আমার জানা থাকলে তোমাকে এভাবে অপ্রস্তুত করতাম না।

রুচিরা সাগ্রহে বলেছে, আমি কিছু মনে করিনি, তুমি কিছু মনে করলে না তো?

–না।…আজ কি পড়বে?

–আজ থাক।

টেবিলের বই দুটো একবার নাড়াচাড়া করে আবার রেখে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। –চলি তাহলে?

কেন যেন ভয়ানক বিচ্ছিরি লাগছিল রুচিরার। তেমনি অস্বস্তি। বলেই ফেলল, পড়াশুনার ব্যাপারে আর তোমার সাহায্য পাওয়ার আশা করাটা ঠিক হবে না বোধহয়?

-কেন?

–আসবে?

–তুমি না চাইলে আসব না।

ভাবের আবেগে রুচিরা বলেছিল, শীতল, তুমি সত্যি অনেক বড়। আমি কিছু না।

— সুশীতল চলে যাবার পর ওর কান্নাই পাচ্ছিল। কেন এ-রকম হল? কেন এ-রকম হয়? সুশীতল খুব–খুব ভাল এটা সে অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু স্বামী হিসেবে তাকে ভাবা যায় না কেন? ও এমন কি মেয়ে? পুরুষের চোখ ধাঁধিয়ে দিতে পারে এমন রূপের সম্বল কিছুই নেই। গায়ের রং ঠিক ফর্সা বলা চলে, স্বাস্থ্য মোটামুটি, নাক-মুখ পটে আঁকা নয়। কেবল,

ওপরতলার কিছু প্রসাদ আছে ওর চোখ দুটোতে। যে দেখে সে-ই সুন্দর বলে। লুকিয়ে চুরিয়ে রুচিরাও আয়নায় নিজের এই চোখ দুটোকে কম দেখে না। ওর আর যা-কিছু রূপ তার সবটাই বুকের তলায়। কারো কষ্ট দেখলে দুঃখ হয়, কারও আনন্দ দেখলে খুশী হয়। কারো উদারতা দেখলে ভিতরটা ভরে যায়, নিপীড়ন দেখলে নিজের ভিতরেই যন্ত্রণা হতে থাকে। কত সময় ভাবে, সকলেই একটু উদার হলে, একটু দরদী হলে, একটু নিঃস্বার্থ হলে, এই পৃথিবীটা তো কত সুন্দর হতে পারে।...হয় না কেন?

চোখ দুটো ছাড়া ওর ভিতরের এই রূপের খোঁজ পেতে হলে স্বাদ পেতে হলে যে অবকাশ দরকার আর অন্তরঙ্গ সান্নিধ্য দরকার, একমাত্র সুশীতল চক্রবর্তীই সেটা পেয়েছিল। কিন্তু তাকে তো সে সরাসরি বাতিল করে দিল। অথচ তার জন্যও যে কত দুঃখ হচ্ছে রুচিরা সেটা কাকে বলবে?

সুশীতল চলে যাবার পরদিনই দিদি এসেছিল, গম্ভীর। হাব-ভাবে বুঝিয়েই দিল বোনের ওপর রাগ হয়েছে। বহুক্ষণের মধ্যে ওর সঙ্গে কোনো কথাই বলল না। ফলে রুচিরার রাগ দ্বিগুণ। ও ভাল কথায় জল, মেজাজ দেখালে আগুন। মনে মনে ভাবল, দিদির চেহারা-পত্র ওর থেকে একটু ভাল, সেই দেমাকে ভাবে ওর দেওরের থেকে ভাল বর আর পাব কোথায়।

রুচিরাও সেধে একটি কথাও বলতে এল না।

যাবার আগে দিদি ব্যঙ্গ করে জিজ্ঞাসা করল, কাকে সব সমর্পণ করে বসে আছিস?

–তোর বরকে! হল?

যা-ই হোক, বোনকে দিদি ভালই বাসে। হেসে ফেলল।-থাপ্পড় খাবি। কে এমন। লোক এল যে শীতলকে একেবারে বাতিল করে দিলি–শুনিই না?

রুচিরার মেজাজ তখনো ঠাণ্ডা হয়নি। চটপট জবাব দিল, বিনয়দার থেকে ভাল এটুকু জেনে রাখ–জানলে তোর হিংসে হতে পারে।

রাগ দেখিয়ে চলে গেল। না গিয়ে করবে কি? দিদির জেরার মুখে পড়লে কি বলবে? কার নাম করবে?

কিন্তু রুচিরা আর যা-ই হোক, মেয়েটা বোকা নয় একটুও। ওরই দিকে চেয়ে একজন বেপরোয়া মানুষ যে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে এটা সে অনুভব করতে পারে। তার নাম ইন্দ্র ব্যানার্জী। এই অভিজাত দক্ষিণ এলাকায় তাকে চেনে না এমন কেউ নেই। রুচিরা অন্তত ছেলেবেলা থেকেই চিনত। কলেজে পড়তেই পাড়ার সমবয়সী ছেলেদের মাতব্বর হয়ে বসেছিল। সেই খুনোখুনির রাজনীতির সময় তার সম্পর্কে গা-কাটা দেবার মত অনেক গাল-গল্প কানে এসেছে। মোট কথা, সেই দুর্যোগের সময় এই এলাকা একেবারে ঠাণ্ডা ছিল শুধু তার দাপটে। একবার মাত্র এই পাড়ার ওপর হামলার সূচনা হয়েছিল। সুযোগ পেয়ে বাইশ বছরের একটা ছেলেকে কারা ছোরা। আর রিভলভার দেখিয়ে জীপে তুলে নিয়ে পালাচ্ছিল। বিধবা মায়ের একমাত্র ছেলে। ঘটনাটা তক্ষুণি পাড়াময় রটে গেছল। সেই বিধবা বুক চাপড়ে রাস্তায় বেরিয়ে অজ্ঞান। হয়ে গেছল। পাড়ার ছেলেরা তাকে ধরাধরি করে রুচিরাদের বাড়ি নিয়ে এসেছিল। রুচিরার বাবা তার চিকিৎসা করেছিলেন। শুধু এ-এলাকার কেন, কলকাতার মধ্যেই। একজন নামী ডাক্তার রুচিরার বাবা।

কিন্তু দুঘণ্টার মধ্যেই পাড়ায় আবার হৈ-চৈ। বিধবার সেই ছেলে অক্ষত অবস্থায় আবার ঘরে ফিরে এসেছে। পরদিন কাগজে খবর বেরিয়েছে, হত্যার উদ্দেশ্যে অমুক জায়গার একটি ছেলেকে কারা জীপে তুলে নিয়ে চলে গিয়েছিল। কোথা থেকে আরো দুটো জিপ হঠাৎ এসে তাদের ওপর চড়াও হয়। অতর্কিতে আক্রান্ত হবার ফলে দুষ্কৃতকারীদের তিনজন গুরুতর আহত হয়, আর বাকি দুজন হত্যার বলি সেই ছেলেটাকে ফেলে পালিয়ে যায়। ছেলেটা নিরাপদে ঘরে ফিরেছে। কিন্তু কে বা কারা তাকে উদ্ধার করেছে জানা যায়নি, কারণ তারাও পুলিস আসার আগে নিজেদের জীপ নিয়ে সরে পড়েছে। ছেলেটাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেও কিছু জানা যায়নি। মনে হয় এটা কোনো রাজনৈতিক দলাদলির ফল। আহতদের অবস্থা আশংকাজনক।

ওই বিধবার ছেলেটা যে রুচিরার বন্ধু সুমিতার পিসতুতো ভাই জানা ছিল না। সে চুপি চুপি রুচিরাকে বলেছিল, এত বুকের পাটা কার জানিস না? ইন্দ্রদার।-খবর কানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে দুটো জীপ নিয়ে আর দল নিয়ে ওদের ঘাঁটিতে গিয়ে। হানা দিয়েছিল।

শুনে রুচিরা কণ্টকিত।–পুলিস জানে না?

–জানলেই বা কি। ইন্দ্রদার বাবা কংগ্রেসের কত বড় চাই জানিস না?

তা অবশ্য জানে। অনেক এম. এল. এ. ছেড়ে কংগ্রেসী মন্ত্রীরাও কত সময়। ইন্দ্র ব্যানার্জীদের বাড়ি আসে।

ইন্দ্র ব্যানার্জীর বাবা হাই ব্লাডপ্রেসারের রোগী। রুচিরার বাবার পেশেন্ট। বাবা বুদ্ধিমান মানুষ, তার কাছ থেকে ফী নিতেন না। বাবার খবর দেবার জন্য ইন্দ্র ব্যানার্জী কখনো-সখনো তাদের বাড়ি আসত। তখন কখনো কখনো রুচিরার সঙ্গে চোখের দেখা হত শুধু, মনের ব্যাপারের ধারে-কাছেও কেউ নেই। কিন্তু রুচিরার ভিতরে ভিতরে এই বেপরোয়া ছেলেটার প্রতি কৌতূহল ছিল।

রুচিরা যখন বি. এ. পড়ে, তখন সেই বন্ধু সুমিতার কাছেই হঠাৎ একদিন শুনল, ওদের ইন্দ্রদা নাকি রুচিরার চোখ দুটোর খুব প্রশংসা করছিল।

সুমিতা বলছিল আর হাসছিল খুব। রুচিরা অবাক, তোকে কে বলল?

বলেছে সুমিতার সেই পিসতুতো ভাই-যে এখন ওই ইন্দ্রদার অন্ধ ভক্ত।

তার দলের ছেলেরা নাকি নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল, ডাক্তারের ছোট মেয়েটার বড় দেমাক, ঝকঝকে গাড়ি চেপে কলেজে যায়, কলেজ থেকে ফেরে– কোনো দিকে তাকায় না। কত যেন রূপসী, যেন তাকালে ছেলেরা হাঁ করে ওকে গেলার জন্য বসে আছে।

তাই শুনে ইন্দ্র ব্যানার্জী নাকি বলেছে, মেয়েটার চোখ দুটো কি সুন্দর লক্ষ্য করে দেখেছিস তোরা? খবরদার ওর পিছনে লাগবি না!

ছেলেরা নাকি তাদের মুকুটমণি ইন্দ্রদার ওই কথায় মুখ-চাওয়াচাওয়ি করে চুপ মেরে গেছে।

শুনে রুচিরার কেন যেন হঠাৎ রাগ হয়ে গেছে, আবার ভিতরে ভিতরে একটু খুশীও হয়েছে। রাগ ছেলেগুলোর কথা শুনে হতে পারে, আবার ইন্দ্র ব্যানার্জীর মুরুব্বিয়ানার কথা শুনেও হতে পারে। ওর পিছনে লাগার সাহস যেন কারো আছে! আর খুশীর কারণ হয়তো বা ছেলেটার দেখার মতো নিজের দুটো চোখা আছে ভেবে। হতে পারে।

কিন্তু ইন্দ্র ব্যানার্জীর সমস্ত চেহারার মধ্যে যে বেশ একটা জোরালো পুরুষের ছাপ আছে এটা রুচিরা নিজের মনেও অস্বীকার করতে পারে না। গায়ের রং মোটামুটি ফর্সা, দস্তুরমতো লম্বা। বুদ্ধিমাখা চাউনি, জোড়া ভুরু। মুখে মিষ্টি মিষ্টি হাসি, কিন্তু ইচ্ছে করলেই চোয়াল দুটো যেন কঠিন হতে পারে। না মোটা না রোগা। মাথার ঝাকড়া চুলে চিরুনির বদলে হাত চালায় বেশি। ওদের বাড়ির পাশ দিয়েই গাড়ি চেপে সে কলেজে যায় আর কলেজ থেকে ফেরে। যাবার সময় প্রায়ই নিজের বাড়ির গেটের সামনে দাঁড়িয়ে সাগরেদদের সঙ্গে আড্ডা দিতে দেখে। ভিতরে একটু কৌতূহল ছিল। বলেই হয়তো বাড়ির সামনে চোখ ফিরিয়ে বড় একটা তাকায় না রুচিরা। যেটুকু দেখার দূর থেকেই দেখে নেয়। কলেজ থেকে ফেরার সময় গেটটা ফাঁকাই দেখে। তখন বড় একটা চোখে পড়ে না।

সুমিতার মুখে এ-খবরটা শোনার পর রুচিরার কেমন মনে হয়েছে, কলেজে যাবার সময় প্রায়ই যে ওই ছেলেকে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে কারো না কারো সঙ্গে কথা বলতে দেখে, তার পিছনে ব্যাপার কিছু থাকতেও পারে। ঘরে বসে আড্ডা দেয় না কেন? সুমিতা চলে যেতে সেদিন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের এই দুটো চোখের দিকেই অনেকক্ষণ তাকিয়েছিল রুচিরা। তারপর নিজেই লজ্জা পেয়েছে। জ্ব কুঁচকে আয়নার সামনে থেকে সরে এসেছে। কিন্তু একটু খুশীর ছোঁয়া যে মনে লেগেছিল সেটা অস্বীকার করতে পারে না। সুমিতার কাছ থেকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে একটা কথা জেনে নিতে পারলে মন্দ হত না। বীরপুরুষটি লেখাপড়া করছে কিনা, বা কদ্দূর

www.bengaliebook.com

করেছে। নাকি বিদ্যাদিগগজ হয়ে মস্তানি করে বেড়াচ্ছে? আবার ভেবেছে, একেবারে শূন্যকুম্ভ হলে পাড়ার অল্পবয়সী এম. এল. এ. দুজন হামেশাই ও-বাড়ি আসে কেন? বাপের সঙ্গে হোমরা-চোমরাদের খুব দহরম-মহরম হলেও ওই দুজনের তার ছেলের সঙ্গেই খাতির বেশি। তারা লেখাপড়া জানা ছেলে শুনেছে। তাদের বন্ধুর পেটে একেবারেই কিছু থাকবে না? তাছাড়া বেপরোয়া হলেও হাব-ভাব আচরণ শিক্ষিত ছেলের মতই।

খেয়াল হতে রুচিরা নিজেকেই চোখ রাঙিয়েছে আবার। লেখাপড়া জানা থোক বা ক অক্ষর গোমাংস হোক, ওর অত ভাবার দরকার কি?

দরকার থাক বা না থাক, পরদিন কলেজ যাবার সময় চেষ্টা করেও চোখ দুটো। অন্য দিকে ফিরিয়ে রাখতে পারেনি। অথচ গাড়িতে ওঠার সময় বার বার নিজের মনে সংকল্প করেছে, কক্ষনো কোনো দিকে তাকাবে না। কিন্তু পরিচিত গেটটা পার হবার আগেই চোখ দুটো ঠিক ওই দিকেই ঘুরেছে।

আর যোগাযোগ এমনি যে, এই দিনে গেটের সামনে একলাই দাঁড়িয়ে সে। সঙ্গী সাথী নেই। রুচিরা ঘাড় ফেরানো মাত্র চোখাচোখি। ওই গেট পার হবার আগেই। আর সঙ্গে সঙ্গে রুচিরার নিজের ওপর রাগ যেমন, ভিতরের গোঁ-ও তেমনি। চেয়ে রইল তো চেয়েই রইল।

সেই ছেলেও।

গেট ছাড়িয়ে গাড়িটা এগিয়ে গেল। রুচিরার তখন নিজের ওপরেই এমনি রাগ যে ইচ্ছে করছিল গাড়িতেই ঘুরে বসে পিছনের কাঁচের ভিতর দিয়ে সেই দিকে চেয়েই থাকে। কারণ চোখাচোখি হতে ইন্দ্র ব্যানার্জীর ঠোঁটের ফাঁকে হাসি দেখেছে। যেন বলতে চেয়েছে এতদিনে সদয় হলে যা হোক

কিন্তু এরপর এই চোখাচোখি হওয়ার ব্যাপারটা প্রায়ই ঘটতে লাগল। রুচিরার ঠোঁটের ফাঁকে কখনো হাসির ছোঁয়া লাগে, কখনো বা ভুরুর মাঝে ছদ্ম বিরক্তির ভাঁজ পড়ে। কথা নেই বার্তা নেই, এ যেন এক মজার খেলা।

দিন-কতক বাদে পর পর কয়েক দিন ওই গেটের সামনে ইন্দ্র ব্যানার্জীকে দেখা গেল না। অসুখ-বিসুখ কিছু করেছে এমন নয়। দুদিন আগে ওর বাবা রুচিরার বাবার কাছে এসে ব্লাডপ্রেসার চেক করিয়ে গেছেন। ওপর থেকে তার গাড়ি দেখে রুচিরা বাবার চেম্বারের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছিল। বাবাকে ধরে নিয়ে গেলে বোঝা যেত। কারো কিছু অসুখবিসুখ করেছে। তা যখন নয় ঘরে ঢুকে তো আর জিজ্ঞাসা করতে পারে না, আপনার গুণধর ছেলের খবর কি?

অপ্রত্যাশিত খবরটা হঠাৎ কাগজে দেখা গেল। কয়েক দিন ধরেই কাগজে জলপাইগুড়িতে ভয়াল বন্যার খবর বেরুচ্ছিল। কাগজের এ-সব খবর রুচিরা দেখেও দেখে না। কিন্তু সেদিন আর না দেখে বা ঘটনাটার আদ্যোপান্ত না পড়ে পারা গেল না। গোড়াতেই ইন্দ্র ব্যানার্জীর ছবি একখানা। তারপর তার দুঃসাহসের প্রশংসার ফিরিস্তি।

...সর্বগ্রাসী বন্যার খবর পেয়ে কলকাতা থেকে কংগ্রেসের এক তরুণ দল সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা নিয়ে জলপাইগুড়ি চলে গেছল। সেই তরুণ দলের নায়ক ইন্দ্র ব্যানার্জী। সেখানে গিয়ে নায়কের মতই একটি কাজ করেছে। নিজের প্রাণের মায়া। তুচ্ছ করে জলমগ্ন কুটিরের এক বুড়ীকে উদ্ধার করে এনেছে। কাগজে যা লিখেছে তা সত্যি হলে ওই ছেলেও যে মস্ত এক ফাড়া কাটিয়ে উঠেছে, সন্দেহ নেই। বুড়ীকে আগলে পুরো ছত্তিরশটি ঘণ্টা অনাহার আর অনিদ্রায় মৃত্যুর মুখোমুখি বসে থাকতে হয়েছিল তাকে।

দিন-কতক বাদে আবার তাকে গেটের সামনে দেখতে পেল রুচিরা। আগের দিনই তার আসার খবর কানে এসেছিল। খুব ঘটা করে মালাটালা পরিয়ে পাড়ার ছেলেরা নাকি তাকে স্টেশন থেকে নিয়ে এসেছে।

গাড়িটা ও-বাড়ির গেট পার হওয়ার সময় এই একটি দিন আবার রুচিরা তাকে যেন দেখতেই পেল না। ইচ্ছে করে রাস্তার উল্টো দিকে মুখ করে বসে রইল। ভেবেছে, অত বাহাদুরির খবর পড়ে রুচিরাও আনন্দে গলে

www.bengaliebook.com

গিয়ে বীরপুরুষকে নতুন চোখে দেখবে। কিন্তু কাগজের ছবি দেখে আর খবর পড়ে রুচিরাও যে দুঃসাহসের প্রশংসা মনে মনে করেনি, এমন নয়।

পরের দিনের ব্যাপারটা অন্যরকম। রুচিরার প্রথমে রাগ যেমন হয়েছে, পরে মজাও তেমনি লেগেছে। ওর কলেজ যাবার সময় ইন্দ্র ব্যানার্জী সেদিনও গেটের সামনে দাঁড়িয়েছিল। সঙ্গে দুজন স্তাবকও ছিল। ও ছেলের সঙ্গী-সাথীদের স্তাবক ছাড়া আর কিছু ভাবে না। দূর থেকে ওদের দেখে এই দিনও রুচিরা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে ছিল।

হঠাৎ গাড়িটা প্রায় থেমেই যেতে ঈষৎ বিস্ময়ে ড্রাইভারের দিকে তাকাতে গিয়ে। রুচিরার সামনের দিকে চোখ পড়ল। রাস্তার ঠিক মাঝখানে গাড়ির পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে ইন্দ্র ব্যানার্জী। গাড়িটা প্রায় থামিয়ে ড্রাইভারও সবিস্ময়ে তাকিয়েছে সেদিকে।

রুচিরার সঙ্গে চোখাচোখি হতে ধীর গম্ভীর মুখে রাস্তা ছেড়ে আবার নিজের বাড়ির গেটের দিকে চলল। রুচিরা ঘাড় ফিরিয়ে দেখে সেখানে অন্য ছেলে দুটো ওর দিকে চেয়েই হাসছে ফিক ফিক করে।

রুচিরা সেদিন জ্বলতে জ্বলতে কলেজে চলল। হিন্দুস্থানী ড্রাইভারটা পর্যন্ত কি ভাবল কে জানে! কিন্তু জ্বলুনি থাকল না বেশিক্ষণ। তার ওপর মজার প্রলেপ পড়তে লাগল।

এর পরদিন থেকে কলেজ যাবার সময় আবার চোখ দুটোকে ওবাড়ির গেটের দিকে ফেরাতে হল তাকে। তা না হলে পরদিনই আবার রাস্তা আগলে দাঁড়াবে কিনা কে জানে। লোকটার ঠোঁটের ফাঁকে জ্বালা-ধরানো হাসি। তাকে অবজ্ঞা করলে কি হবে সেটাই যেন বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। রুচিরার এ জুলুম বরদাস্ত করার ইচ্ছে নেই। কিন্তু রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে গেলে ও করবে কি? আর টের পেয়ে গেলে লোকেই বা ভাববে কি? এর থেকে একবার ঘাড় ফিরিয়ে তাকানো স্বস্তির ব্যাপার।

আরো কিছুদিন পরের কথা। রাত তখন সাড়ে নটা। পড়াশুনার পাট শেষ করে রুচিরা খাবার টেবিলের দিকে যাচ্ছিল। দাদা তার উদ্দেশ্যে একটা হাঁক

দিয়ে বসে গেছে। রাতে দাদা-বউদির সঙ্গে খায়। দিনের বেলা যে-যার সময় মত খেয়ে নেয়। রাতে বাবার খাওয়া একটু দুধ, একটা সন্দেশ, আর খই। তার খাবারটা মা এর অনেক আগেই ঘরে দিয়ে আসেন।

বাধা পড়ল। পুরনো চাকর মহেশ এসে বলল, একটি বাবু নীচে ডাকছেন।

রাত সাড়ে নটায় নীচে বাবু ডাকছেন শুনে রুচিরা হাঁ। ছেলেদের মধ্যে এ বাড়িতে একমাত্র আসে সুশীতল। তাকে খবর দিয়ে আসতে হয় না। সরাসরি আসে।

-কে বাবু?

–ইন্দরবাবু।

রুচিরা হতচকিত কয়েক মুহূর্ত। কি করবে বা কি বলবে ভেবে পেল না। তারপর। মায়ের চোখের আড়াল হয়ে চুপচাপ নীচে নেমে এল। রাত সাড়ে নটায় বাড়ি এসে চাকর দিয়ে তাকে খবর দেওয়া যে চলবে না এটা প্রথম দিনেই তাকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার।

বৈঠকখানার দরজা খোলা। ইন্দ্র ব্যানার্জী সেখানে দাঁড়িয়ে দেওয়ালের ছবি দেখছে। মুখ গম্ভীর, একটু ক্লান্তও যেন।

রুচিরা এসে দাঁড়াতেই কোনো ভূমিকা না করে বলল, আমি ডক্টর গাঙ্গুলীর কাছে এসেছিলাম, কিন্তু এখানকার লোকটা বলল, ডাক্তারবাবুকে এখন আর খবর দেওয়া চলবে না, তাই একটু বিরক্ত করতে হল। ডক্টর গাঙ্গুলীকে একবার খবর দিতে হবে, বিশেষ দরকার।

চোখ-মুখ দেখে রুচিরার মনে হল কারো বাড়াবাড়ি গোছের ব্যাপার কিছু। প্রথমেই তার বাবার কথা মনে হল।

-বসুন, আমি খবর দিচ্ছি।

দৌড়ে ওপরে চলে এল। ডাক্তারের বাড়ি, এ-সব ব্যাপারে ঘড়ির নিয়ম মানা চলে না। বাবা তখন আধ-শোয়া হয়ে একটা ডাক্তারি জার্নাল পড়ছেন। বলল, ইন্দ্র ব্যানার্জীর বাবার বোধহয় বাড়াবাড়ি অসুখ কিছু হবে, সে নীচে তোমাকে ডাকছে, বলল খুব দরকার

শুনে রুচিরার বাবা একেবারে তৈরি হয়ে তাড়াতাড়িই নেমে এলেন। পিছনে রুচিরাও না এসে পারল না। কিন্তু তারপর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে যে-কথা শুনল, তার দু-চক্ষু স্থির। শোনার পর লোকটার ওপর যত রাগ, বাবাকে না বুঝে-শুনে এভাবে ডেকে আনল বলে তেমনি সংকোচ।

বাবা ঘরে ঢুকতেই দুহাত তুলে নমস্কার জানিয়ে ইন্দ্র ব্যানার্জী বলল, আপনাকে এখনই একবার আমার সঙ্গে এক জায়গায় একটু যেতে হবে।

এ-কথা শুনে বাবা অবাক।–কি ব্যাপার?

–চলুন। সঙ্গে গাড়ি আছে। গাড়িতে বসে বলছি।

এবারে বাবা বিরক্ত একটু।–এত রাতে আমি কোথাও যাই না–কোথায় যেতে। হবে?

-পার্ক সার্কাসের দিকে। আমার এক বন্ধু কিছুদিন ধরে ভুগছিল, টাকা-পয়সার অভাবে ভাল ডাক্তার দেখাতে পারেনি। খবর পেয়ে তাকে দেখতে গেলাম। গিয়ে দেখি অজ্ঞান হয়ে আছে। চার টাকা ফী-এর এক ডাক্তার দেখছিল, সে কিছু বুঝতে পারছে বলেই মনে হল না। আপনি দয়া করে চলুন আমার সঙ্গে, আমি নিজে আবার আপনাকে পৌঁছে দিয়ে যাব

বিরক্তি চেপে বাবা বললেন, কিন্তু এত রাতে আবার আমি পার্ক সার্কাস যাব-ওদিককার কাউকে পেলে না?

লোকটার জবাব দস্তুর মত উদ্ধত ঠেকল রুচিরার কানে। সে বলছে, আর দেরি করবেন না, আমি আপনাকেই নিয়ে যাবার জন্য এসেছি, আমি সঙ্গে থাকছি, আপনার কোনো ভয় নেই। আর রাতও খুব একটা বেশি হয়নি।

বাবা তার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন একটু। তারপর বললেন, আচ্ছা, তুমি গাড়িতে গিয়ে বসো, আমি ব্যাগটা নিয়ে আসছি–

ইন্দ্র ব্যানার্জী ও-দিকের দরজা দিয়ে বেরুলো, বাবা এদিকে ফিরলেন। দরজার কাছে রুচিরাকে দেখে বললেন, ব্যাগটা এনে দে–

মেয়ের দ্বিধা দেখেই তিনি বুঝলেন সে না বুঝেই তাকে ওপর থেকে ডেকে এনেছে। গলা খাটো করে বললেন, ঘাবড়াবার কিছু নেই, ব্যাগটা নিয়ে আয়–না গেলে বরং ঝামেলার ব্যাপার হতে পারে, দিন-কাল ভাল নয়।

রুচিরা তক্ষুণি ওপরে এসে বাবার ডাক্তারি ব্যাগটা এনে দিল। কিন্তু ভিতরে ভিতরে প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে তার ওই লোকটার ওপর। বাবাকে প্রায় শাসিয়েই এই রাতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে মনে হতে লাগল তার।

এক ঘণ্টার মধ্যেই বাবা বাড়ি ফিরলেন। রুচিরা দোতলায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। নিজেই জীপ ড্রাইভ করে বাবাকে বাড়ির দরজায় নামিয়ে দিয়ে গেল।

কিন্তু দোতলায় উঠতে রুচিরা দেখল বাবার এখন প্রসন্ন মুখ। তার হাত থেকে ব্যাগটা নিতে নিতে রুচিরা জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল। বাবা বললেন, না রে, ছেলেটার অন্তঃকরণ আছে। গিয়ে দেখি ওর সেই বন্ধু বলতে গেলে এক বস্তি-ঘরের ছেলে। তাকে ঘিরে বিধবা মা আর বোন-টোনগুলো কান্নাকাটি করছে।...হার্ট অ্যাটাক, বেঁচে যেতে পারে হয়তো, কিন্তু ঝামেলা আছে। আমাকে নিয়ে ফেরার আগে ওই বিধবা মায়ের হাতে ব্যানার্জীর ছেলেটা তিনশো টাকা গুঁজে দিয়ে এল দেখলাম, বলল, কান্নাকাটি রেখে এখন ভাল শুশ্রূষার দিকে মন দিন, কিছু ভাবনা নেই, ভাল চিকিৎসাও হবে, সেরেও যাবে।

রুচিরা তবু ফোঁস করেই বলে উঠল, আর তোমার ফী?

বাবা হাসলেন। বললেন, দূর পাগলি, এই দেখেও হাত পেতে আমি ফী নিতে পারি নাকি! চৌষট্টি টাকা ফী দেবার জন্যেই ঝোলাঝুলি করছিল, আমি ধমকে উঠতে আর কিছু বলেনি।

শুনল যা তাতে কারো রাগ হবার কথা নয়। শুনে ওরও ভাল খুবই লেগেছে। কিন্তু ওই দাপট দেখিয়ে বাবাকে টেনে বার করে নিয়ে গেছল যে সেটা কিছুতে ভোলা যাচ্ছিল না।

পরদিন গেটের সামনে ইন্দ্র ব্যানার্জীকে দেখা গেল না। মন বলল, তার সেই অসুস্থ গরীব বন্ধুকেই দেখতে গেছে।

সন্ধ্যের দিকে জীপ হাঁকিয়ে তাকে বাবার চেম্বারে আসতে দেখেছে পর পর কয়েকদিন। আবার একদিন দিনের বেলায় এসে বাবাকে নিয়েও গেছে। রুচিরা সব দোতলা থেকেই লক্ষ্য করেছে। একদিনও নীচে নেমে আসেনি। কিন্তু এখন আর রাগ নেই। ভিতরে ভিতরে উল্টে কেন যেন খুশীই একটু। বন্ধুর কঠিন অসুখে বাবা সাহায্য করছেন বলে কি আর কোনো কারণে, বলা শক্ত।

.

দুজনের সম্পর্কটা বেশ একটু সরস নাটকের দিকে গড়ালো রুচিরার বি. এ. পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুনোর পর। গাড়ি চেপে সেদিন বিকেলের দিকে, দিদির বাড়ি যাচ্ছিল, ওই মূর্তি তখন তার বাড়ির গেটে দাঁড়িয়ে। গাড়িতে ওকে আসতে দেখেই গেট ছেড়ে রাস্তায় এসে একটা হাত তুলে ড্রাইভারকে গাড়িটা থামাতে হুকুম করল। আর হিন্দুস্থানী ড্রাইভারটাও কিছু না বুঝে গাড়িটা থামিয়ে নিল।

মিষ্টি মিষ্টি হেসে পিছনের খোলা কাঁচ নামানো জানলায় দু-হাতে ঠেস দিয়ে বলল, কংগ্রাচুলেশনস!

রুচিরা হাসছে না। গম্ভীর।–কেন?

–শুনলাম বি. এ. পরীক্ষায় তুমি সেকেন্ড ক্লাস ফার্স্ট হয়েছ

তুমি! শোনার সঙ্গে সঙ্গে হাড়-পিত্তি যেন একসঙ্গে জ্বলে উঠল রুচিরার। আর সঙ্গে সঙ্গে কাণ্ডজ্ঞানও প্রায় খুইয়ে বসল। বলে উঠল, থ্যাংক ইউ। তা তোমার নিজের পড়াশুনার দৌড় কদ্দূর?

এই ঝাপটা খেয়েই ইন্দ্র ব্যানার্জী যেন, সত্যিকারের খুশীতে আটখানা একেবারে। তার যেন কান-মন জুড়িয়ে গেল। এ-যাবৎ মেয়েদের ও স্তব-স্তুতি দেখে অভ্যস্ত। এই এক মেয়ে তার ব্যতিক্রম বটে।

বলল, নিশ্চয় সেটা তোমার জানার অধিকার আছে। তিন বছর আগের কলকাতা য়ুনিভার্সিটির গেজেট খুলে দেখো–কোনরকমে এম. এস-সি-টা পাস করেছিলাম!

এ-খবর অপ্রত্যাশিত বটে। সোজা মুখের দিকে আবার তাকাল রুচিরা, মিথ্যে বলল বলে মনে হল না। কিন্তু এ-ভারে জানলায় ঠেস দিয়ে গাড়ি থামিয়ে রাখাটাই বা বরদাস্ত করে কি করে? তাছাড়া আবারও তুমি বলল, আর বলল, জানার তোমার অধিকার আছে। রুচিরার তার ওপর অধিকার ফলাবার কি দায় পড়েছে?

তেমনি ঝাঝালো সুরেই আবার বলে উঠল, তবে আর কি, এতবড় পণ্ডিত হবার, পর রাতদিন এখন লোকের ওপর মাতব্বরি করে বেড়ানো ছাড়া আর কি কাজ থাকতে। পারে!

-সে কি কথা! উৎফুল্ল অথচ আহত যেন।-আমার ওপর এই বিচার তোমার,! তুমি কলেজে চলে যাবার পরেই নাকে-মুখে ভাত গুঁজে আমাকে ছুটতে হয় কারখানায়, আমি এখন একখানা কেমিক্যাল ফার্মের অর্ধেক মালিক সে-খবর রাখো?

এ জবাব শুনে রুচিরার মেজাজ আরো গরম হল বই ঠাণ্ডা হল না। বলে উঠল,, আমি তোমার কোনো খবরই রাখি না–বুঝলে? ড্রাইভার!

ড্রাইভারটা কি ভেবে গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করে দিয়েছিল কে জানে। ডাক শুনে তাড়াতাড়ি চাবি ঘুরিয়ে সেলফ টানল।

কিন্তু ইন্দ্র ব্যানার্জী হাসছে। আর তক্ষুনি জানলা ছেড়ে সরে দাঁড়াল না। বলল, মেয়েদের এমন খামোখা রাগের কি যে অর্থ কে জানে! আমি আরো খুশী হয়ে এলাম অভিনন্দন জানাতে! যাক, আমার সম্পর্কে খবর রাখে না এ তল্লাটে এমন কেউ আছে জানা ছিল না।...খবর এরপর আমিই দিতে চেষ্টা করব তাহলে।

গাড়ি ছেড়ে সরে দাঁড়াতে ড্রাইভারটাই যেন হাঁপ ফেলে বাঁচল। গাড়ি ছাড়ার পর রুচিরার মেজাজ ঠাণ্ডা হতে বেশি সময় লাগেনি। সত্যি তার রাগ করার কোনো মানে হয় না। পাড়ার মধ্যে নামজাদা মানুষ একটা তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ওই শুরুতেই তুমি শুনে মেজাজটা বিগড়ে গেছল। জবাবে সেও ছেড়ে কথা বলেনি—তুমি'ই বলেছে। এত হিম্মত এ-তল্লাটের কোনো মেয়ের হত বলে মনে হয় না। যেতে যেতে সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে একটা অজানা রসের মতো পেতে লাগল রুচিরা। ...এমন ডাকসাইটে মাতব্বর মানুষ, ওর পাসের খবরটা ঠিক রেখেছে। আবার রুচিরার রাগের জবাবে চান্স পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজের এম. এস-সি পাস করার খবর জানিয়ে দিয়েছে। রুচিরা এটা সত্যিই আশা করেনি। এম. এস-সি পাস জেনে এখন যেন একটু ভালই লাগছে। বিদ্বানের দুরন্তপনা একটু অন্য ব্যাপার। সেটা মস্তানির পর্যায়ে পড়ে না। তাছাড়া চাকরি-বাকরির মধ্যে না ঢুকে নিজে কেমিক্যাল কারখানা করেছে এটাও পুরুষোচিত কাজ মনে হয়েছে। গোলামি করা রুচিরা দুচক্ষে দেখতে পারে না। তাছাড়া ওই লোক কোথাও চাকরি করতে গেলে রক্তারক্তি করে বেরুনোও বিচিত্র নয়।

মরুকগে। রুচিরা. এ-সব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে কেন? মাথায় ব্যাপারটা তবু ঘুরপাক খেতেই থাকল।...কায়দা করে কারখানার আধখানা মালিকানার কথাও জানিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু এর মধ্যে একটা কথা ঠিকই কানে লেগে আছে রুচিরার। ও গাড়ি চেপে এই গেট ছাড়িয়ে কলেজের দিকে চলে গেলেই ওই লোক নাকে-মুখে ভাত গুঁজে কারখানায় ছোটে। তার মানে, বাড়ির গেটের কাছে ও-সময় তার দাঁড়িয়ে থাকাটা শুধু ওরই জন্যে। কথাবার্তার মধ্যেও কোথাও যদি ছিটেফোঁটা রাখা-ঢাকার ব্যাপার থাকত! নির্লজ্জ আবার কাকে বলে!...এর পর থেকে নিজেই নিজের খবর দেবে

www.bengaliebook.com

বলে দিল। রুচিরার অস্বস্তি। এ-লোক মুখে যা বলে কাজেও অনায়াসে তাই করতে পারে। কি করবে? রোজ রাস্তায় এভাবে গাড়ি আটকাবে, না, বাড়ি এসে হাজির হবে? রুচিরার ভাবনাই ধরে গেল।

সে য়ুনিভার্সিটিতে ঢোকার মুখে এই লোককে নিয়ে ঝামেলার মোড় ঘুরল আর এক ভাবে। ঝামেলা ছাড়া আর কি বলবে রুচিরা? না, গাড়ি আর একদিনও থামায়নি। আর রুচিরার সময়ের হিসেব পায় না বলে রোজ আর গেটেও দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় না তাকে। এম. এ. ক্লাসের রুটিন আর কলেজের রুটিনে তফাত আছে। কোনোদিন এগারোটায় ক্লাস, কোনোদিন বারোটায়, কোনোদিন একটায়। এই রুটিনের কল্যাণেই এদিক থেকে কিছুটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেছে। এদিকে য়ুনিভার্সিটিতে ঢোকার পর রুচিরার যাতায়াতের ব্যবস্থাও কিছু বদলাতে হয়েছে। বিকালের দিকে বাবা বড়জোর এক ঘণ্টা সোয়া ঘন্টার জন্য গাড়ি ছেড়ে দিতে পারেন। আগে কাছেই কলেজ ছিল, ড্রাইভার এক ফাঁকে গিয়ে তাকে নিয়ে আসত। তাই যাতায়াত দুটোই বাড়ির গাড়িতে চলত। এখন শুধু যাওয়াটা গাড়িতে হয়। আসাটা ট্রামে বা বাসে। কিন্তু রুচিরা এ পর্যন্ত ট্রাম বা এমনি বাসে উঠতেই পারে না। ওই গাদাগাদি ভিড় দেখলেই তার মাথা ঘোরে। দুই একদিন চেষ্টা করে উঠেছিল। কিন্তু ভিড়ের চাপে দম বন্ধ হওয়ার দাখিল। মেয়ে দেখলে অসভ্য লোকগুলোর চাপাচাপি যেন আরো বাড়ে। সবাই যে অভব্য তাই বলে তা নয়, বেশির ভাগই সভ্য। কিন্তু এমন যাচ্ছেতাই ভিড় হলে লোকে করবেই বা কি।

অতএব ওকে আসতে হয় বেশি পয়সা খরচ করে মিনিবাসে। কিন্তু ওই সময়ে। মিনিবাসও বেশির ভাগ বোঝাই হয়ে আসে। পর পর কয়েকটা ছাড়লে একটাতে যদি জায়গা মেলে। তাও না হয় হল, কিন্তু কোনো মিনিবাসই তো উত্তর থেকে টানা দক্ষিণ কলকাতায় আসে না। এসপ্লানেডে এসে সেই মিনিবাসও আবার চেঞ্জ করতে হয়। আর এটাই সব থেকে অসহ্য ব্যাপার। এক ঘণ্টা দাঁড়িয়েও একটা মিনিবাস ধরতে পারে না এমনও হয়। ফলে রোজই বাড়ি ফিরতে রুচিরার সন্ধ্যে গড়িয়ে যায়, যার ফলে বাড়ি ফেরার পর থেকে মেজাজটা খিঁচড়েই থাকে। সমস্যাটা মাকে বলেছে। মা বলেছে বাবাকে। বাবা ধকলটা অস্বীকার করেন না, কিন্তু মুখে

বলেন, দশজনে। যা করছে তাই একটু-আধটু করতে পারার অভ্যাস থাকা ভাল–তা না হলে রুচির জন্যে তো আবার একটা গাড়ি কিনতে হয়।

আবার একটা মানে দাদার জন্য একটা ছোট গাড়ি আছে এবং সেটা বাবার টাকাতেই কেনা। দাদাও ডাক্তার। কিন্তু তার গাড়ি চাওয়া আর তার একখানা হাত বা পা চেয়ে বসা যেন একই ব্যাপার। দাদার পসার বাবার ষোল আনার এক আনাও না। কিন্তু সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তার গাড়ি চরকির মতো কলকাতার রাস্তা চষে বেড়াচ্ছে। গাড়ি পেতে হলে বউদিকেই দস্তুরমতো ঝগড়াঝাটি করে আদায় করতে হয়। তাছাড়া দাদার গাড়ি পেলেই বা কি? চালাবে কে? দাদা তার নিজের গাড়ির নিজেই ড্রাইভার।

গাড়ি আরো একখানা বাবা ইচ্ছে করলে কিনতে পারেন বটে, কিন্তু এম. এ. পড়ার জন্য ড্রাইভার সমেত আরো একটা গাড়ি রাখার কথা ভাবতেও রুচিরার লজ্জা।

এই ভাবেই চলেছিল গোড়ার মাস দুই। তারপর হঠাৎ ব্যতিক্রম একদিন। ছুটির পর মিনিবাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল। ঘ্যাঁচ করে পাশেই একটা জীপ এসে থামল। তার পরেই চক্ষুস্থির রুচিরার। সেই জীপে শুধু ড্রাইভার বসে। এবং সে স্বয়ং ইন্দ্র ব্যানার্জী। রুচিরা তাকে না দেখতেই চেষ্টা করল। তাড়াতাড়ি অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল। কিন্তু জীপ থামিয়ে যে দাঁড়িয়ে গেছে সে এটুকু দেখেই চলে যাবার লোক নয়। জীপের ওই বিতিকিচ্ছিরি হর্নটা টিপে ধরে বসে রইল। আর একটানা সেই শব্দে বাসের জন্য আর যারা অপেক্ষা করছিল, চকিত হয়ে তারা ওদের দুজনকেই দেখতে লাগল।

বিপাকে পড়ে রুচিরাকে আবার ওই জীপের দিকেই ঘুরে দাঁড়াতে হল। আর একগাল হেসে তক্ষুণি ওই বেহায়া বেশ চেঁচিয়েই অতিপরিচিতের মতো বলে উঠল, রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়াশুনার ধ্যান হচ্ছে নাকি? উঠে এস

ঠিক যেমনটি হলে রুচিরার মাথায়ও ঝোঁক চেপে যায়, এও যেন তেমনি। পরিস্থিতি একটি। কোনোদিকে না চেয়ে সোজা জীপে উঠে এল। পাশের সীটে বসল। তারপর গাড়ি তিরিশ গজ এগোতেই ঝাঝাল গলায় জিজ্ঞাসা করল, এ-রকম অসভ্যতার মানে কি?

সামনের দিকে চোখ রেখে হাসিমুখে নির্লিপ্ত গলায় ইন্দ্র ব্যানার্জী ফিরে জিজ্ঞাসা করল, দেখেও না-দেখার ভান করে অন্য দিকে ঘাড় ফিরিয়ে থাকার মানে কি?

-মানে আমার দেখার ইচ্ছে নেই।

–আমারও অসভ্যতার মানে জোর করে দেখানোর ইচ্ছে।

আরো রাগত স্বরে রুচিরা বলল, আমি জীপে না উঠলে কি করতে পারতে?

–না উঠতে পারলে তুমি উঠতে না। আমার ইচ্ছে বাতিল করা খুব সহজ ব্যাপার নয়।

–তাহলে গাড়ি থামাও, আমি নেমে যেতে পারি কিনা দেখো!

থামানোর বদলে হাসতে হাসতে গাড়ির বেগ আরো বাড়িয়ে দিল ইন্দ্র ব্যানার্জী। তারপর আলতো করে বলল, এত রাগের কারণ কি, ট্রামে-বাসে চাপাচাপি করে যেতে খুব ভাল লাগত?

–হ্যাঁ, লাগত। তোমার তাতে কি? সত্যি সত্যি এত রাগ কেন হচ্ছে রুচিরা জানে না।

-হিংসে, স্রেফ হিংসে।...তা বাসের জন্য অপেক্ষা করছিলে, গাড়ি কি হল? রুচিরা এবার চেষ্টা করল ঠাণ্ডা হতে। ও যত রেগে যাচ্ছে, লোকটার যেন তত মজা। জবাব দিল, গাড়ি ঠিকই আছে, কারো হিংসে হলেই এখানে চার বার করে গাড়ি যাতায়াত করবে না।

-তার মানে রোজ ট্রাম-বাসে যাতায়াত?

–আসি গাড়িতে, যাই মিনিবাসে।

–তার মানে তো আবার একদফা এসপ্লানেডে চেঞ্জ!

–তাতে কার কি?

হাসছে আবার বলল, এই যুগটাই অন্যরকম। কত ধকল বাঁচালাম, উপকার করলাম–তার বদলে পাচ্ছি রাগ। অবশ্য এও আমার ভালই লাগছে।

– আবারও রাগের অনুভূতিটা ঠেলে তরল করল রুচিরা। ঠাণ্ডা মুখে জিজ্ঞাসা করল, ধকল বাঁচানো আর উপকার করার জন্য জীপ নিয়ে ঘুরে বেড়াও?

হাসছে।–কাজ না থাকলে তাও বেড়াই। ধকল বাঁচানো আর উপকার করার। মতো মেয়ে দেখলে তুলেও নিই।

কানের ভিতরটা রি-রি করে উঠল রুচিরার।–আমাকে তুলে নেবার মতো মেয়ে ভেবেছ?

সামনে চলন্ত গাড়ির ভিড়। তার ফাঁকেই মুখ ঘুরিয়ে ওকে একবার ভাল করে দেখে নিল। হেসে উঠল হা-হা করে। জবাব দিল, তুলে নিলাম কিনা দেখলে না?

রুচিরা গুম হয়ে বসে রইল। মনে মনে নিজেরই মুন্ডপাত করতে লাগল সে। কেন সে জীপে উঠতে গেল! এবারে কিছুটা আন্তরিক সুরে ইন্দ্র ব্যানার্জী বলল, সত্যি অনেক দিন তোমাকে না দেখে মেজাজটা এত খারাপ হয়ে গেছল! আজ ভাগ্যিস ঠিক এই সময়ে এখান দিয়েই যাচ্ছিলাম!

এ-কথা শোনার পর রুচিরার কেন যেন আগের মতো রাগ হল না। দোষ এই লোকেরই। হঠাৎ হঠাৎ মগজের মধ্যে ওলট-পালট কাণ্ড বাধিয়ে দেয়। ইচ্ছে থাকলেও ঠাণ্ডা মাথায় এখন দুটো ভাল কথা বলার উপায় নেই।

এসপ্লানেড ছাড়িয়ে জীপ মাঠের মাঝের ফাঁকা রাস্তা ধরে ছুটল। স্পীড কম করে ষাট মাইল হবে। রুচিরা আড়চোখে দেখছে এক-একবার। লোকটার যেন ধৈর্য বলে কিছু নেই, সবেতে হুড়মাড় ব্যাপার।

বাড়ির সামনের মোড়টার কাছে আসার আগেই রুচিরা বলল, এখানে থামতে হবে।

www.bengaliebook.com

-কেন?

–আমি নামব।

–কেন?

–কেন আবার কি, আমার খুশি!

কেন এখানে নামতে চায় ইন্দ্র ব্যানার্জীর না-বোঝার কথা না। বাড়ির লোকেরা আর পাড়ার লোকের চোখ এড়াতে চায়। আপত্তি না করে জীপ থামাল। রুচিরা নেমেই হন হন করে সামনে এগোলো। পিছনে বসে লোকটা যে হাসছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

পরদিনও য়ুনিভার্সিটির শেষ ক্লাস সারা হবার আগে রুচিরার কেমন মনে হল ইন্দ্র ব্যানার্জী আজও জীপ নিয়ে আসবে। প্রোফেসারের লেকচার শোনা হয়ে গেল। আর কিছু কানে ঢুকছে না। ঘণ্টা বাজতে রুচিরা বেরিয়ে আসতে আসতে ভাবছিল, তাকে ফাঁকি দেবার জন্য উল্টো দিকের কোনো ট্রামে বা বাসে উঠে পড়বে কি না। কিন্তু ভিতর থেকে সায় মিলল না। তাতে কোথায় যেন নিজেরই লোকসান। আসে। যদি, আর কিছু না হোক বাসে ওঠা আর বাস বদলানোর ধকলটা তো বাঁচে।

য়ুনিভার্সিটির গেটের বাইরে পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে সেই পরিচিত হর্ন। রুচিরা বিষম চমকে ঘুরে তাকাল। আজ একেবারে য়ুনিভার্সিটির ফুটপাথ ঘেঁষেই জীপ নিয়ে অপেক্ষা করছে। হাসছে।

রুচিরা থমকে দাঁড়াল একটু। চোখে চোখ। হঠাৎ হাসি পেয়ে যাচ্ছিল তারও। কিন্তু হাসল না। এমন মুখ করে জীপে গিয়ে উঠে বসল যেন ওরই জীপে ড্রাইভার গোছের কেউ অপেক্ষা করছে। ভিড়ের মধ্য দিয়ে সুপটু হাতে চালাতে চালাতে হৃষ্টমুখে ইন্দ্র ব্যানার্জী বলল, আজও আসব, ভাবনি তো?

ভেবেছি। তোমার কেমিক্যাল কারখানা কি এদিকে নাকি?

হেসে উঠল।আমার কারখানা উল্টোদিকে, এখান থেকে বারো মাইল দূরে সেই যাদবপুর ছাড়িয়ে গড়িয়ার কাছাকাছি।

-তেলের অভাব নেই বোঝা যাচ্ছে।

ইন্দ্র ব্যানার্জী আরো হাসতে লাগল।–এই দিনে আবার তেলের অভাব! একটু তেল দেবার জন্য গৌরী সেনরা সব বসেই আছে।

-বেশ। এ-রকমটা সপ্তাহের মধ্যে কদিন চলবে?

–এ-রকমটা মানে?

–এই বারো মাইল ঠেঙিয়ে, এসে আমার ট্রাম-বাসের ধকল বাঁচানো?

গম্ভীর মুখেই একটু হিসেব করে নিল।-সপ্তাহে দুতিন দিন আমাকে চৌরঙ্গীর দিকে আসতেই হয়।

ছদ্ম গাম্ভীর্যে একটা নিশ্বাস ফেলল রুচিরা। মাত্র!

ইন্দ্র ব্যানার্জী সকৌতুকে ফিরে তাকাল একবার।-বল তো বাকি কদিন কারখানার ড্রাইভারকে দিয়ে জীপ পাঠিয়ে দিতে পারি।

রুচিরা এবারে উৎসুক যেন একটু। ঘুরে তাকাল।–দুতিন দিনই যথেষ্ট, এই দুতিন দিনও শুধু ড্রাইভারকে পাঠানো যায় না?

ইন্দ্র ব্যানার্জী আবার ঘাড় ফেরালো তার দিকে। রুচিরা হেসেই ফেলল।

.

বলতে গেলে বছরের মধ্যে ছমাসই ছুটি কলেজ-য়ুনিভার্সিটিগুলোর। সব মিলিয়ে বাকি ছমাসের মধ্যে সপ্তাহে দুতিন দিন সত্যিই ইন্দ্র ব্যানার্জীর জীপে চেপে সে বাড়ি ফিরেছে। না, বাড়িতে নয়, সামনের ওই মোড় পর্যন্ত। কিন্তু পাড়ার অনেকের সেটা চোখে পড়েছে। য়ুনিভার্সিটির ছেলে-মেয়েরা তো কিছু একটা ধরেই নিয়েছে। কিন্তু সত্যিই এই একটা বছরে ভবিষ্যৎ

নিয়ে কোনো দিন কোনো রকম কথা-বার্তা হয়নি। মানুষটা কত যে বেপরোয়া এই একটা বছরে রুচিরা খুব ভাল বুঝে নিয়েছে। এ-রকম লোককে কথায় কৌতুকে বিদ্রূপে নাজেহাল করতে পারার মধ্যে বেশ একটা মাদকতা আছে। মেজাজ দেখালে রুচিরা ডবল মেজাজ দেখায়। ইন্দ্র ব্যানার্জী ওর দিকে চেয়ে হাসে। বলে, তোমার অদৃষ্টে দুঃখ আছে।

রুচিরা জবাব দেয়, অদৃষ্টের হাত তোমার ইচ্ছেয় ঘুরবে না কোনোদিন।

কিন্তু এর বেশি কথা কখনো হয়নি।

এরপর সুশীতল চক্রবর্তীর ওই প্রস্তাব, আর রুচিরার প্রত্যাখ্যান এবং অস্বস্তি। সুশীতল যা বুঝে গেছে তার অনেকটাই যে সত্যি, রুচিরা সেটা অনুভব করে। কিন্তু সত্যি তো ইন্দ্র ব্যানার্জীর সঙ্গে এ-নিয়ে কোনো রকম ফয়সলায় আসেনি সে।

দুদিন বাদে তার সঙ্গে দেখা। জীপ একটু ফাঁকায় আসতে রুচিরা জিজ্ঞাসা করল, সুশীতল চক্রবর্তীকে চেনো?

-না। সে আবার কে?

–য়ুনিভার্সিটির নামকরা ছাত্র ছিল আগাগোড়া, এখন কলেজের প্রোফেসর। সম্পর্কে দিদির দেওর। বি. এ. পড়ার দুবছর আমাকে বাড়িতে এসে পড়িয়েছে–

মুখে শুঙ্কার ভাব এনে ইন্দ্র ব্যানার্জী জিজ্ঞাসা করল, বিনে পয়সায়?

-তাছাড়া আবার কি? এখনও পড়াচ্ছে।

–কি সর্বনাশ! তারপর?

পরশুর আগের দিন সে এসে বিয়ের প্রস্তাব করেছিল।

রুচিরা হঠাৎ সত্যি সত্যি গম্ভীর দেখল ইন্দ্র ব্যানার্জীর মুখ। জীপটা রাস্তার ধারে– থামিয়ে দিতে দেখে আরো অবাক।

ইন্দ্র ব্যানার্জী জীপেই ঘুরে বসল তার দিকে।লোকটার ঠিকানা কি?

–তার ঠিকানা দিয়ে কি হবে?

–ধড় থেকে মাথাটা নামিয়ে নিয়ে আসি।

রুচিরা হঠাৎ যেন ধাক্কাই খেল একটা। মানুষটা সত্যি-সত্যি ক্রুদ্ধ না ইয়র্কি করছে তাই বোঝা গেল না। এবারে সেও ঝাঁঝিয়ে উঠল, ইস, মুরোদ কত, তুমি তার গায়ে আঙুল ছুঁইয়ে দেখ দেখি!

এবারে ঠাণ্ডা হল একটু।–তোমার সায় না থাকলে ছোঁয়াব না। তারপর কি দাঁড়াল?

–কি আবার দাঁড়াবে? মাঝখানে তুমি দাঁড়ালে।

এবারে উৎফুল্ল।–সত্যি?

রুচিরা হাসিমুখে মাথা নাড়ল। সত্যি।

আনন্দে জীপ হাঁকাল আবার। একটু ভেবে নিয়ে রুচিরা বলেই ফেলল, কিন্তু এ-ভাবে আর কতদিন চলতে পারে? তোমার মতলবখানা কি?

–আমার মতলব অনেকদিন ধরেই খারাপ। এম. এ. পরীক্ষার আগে তোমার যদি আপত্তি না থাকে তো ঝুলে পড়ি এসো!

রুচিরা ধমকে উঠল, কথাবার্তার ছিরি কি! বাবাকে তো বলতে হবে।

–আজই চল। বলে ফেলি।

রুচিরা হেসে ফেলল। ভাল লাগছে। এই মানুষকে ভয়ানক ভাল লাগছে আজ তার। এরকম ভাল লাগার স্বাদ এই যেন প্রথম। মাথা নাড়ল, তোমাকে বলতে হবে না, আমি মাকে বলে রাখব, আমাদের বাড়ি থেকে তোমার বাবার কাছে প্রস্তাব গেলে তিনি যেন আকাশ থেকে না পড়েন–তাঁকে বলে রেখো। বুঝেছ?

-খুব বুঝেছি। তোমার আমার ব্যাপারের মধ্যে আবার বাবা-মাদের ধরে টানাটানি। ঠিক আছে

জীপ হাওয়ায় ছুটেছে এখন। এক নামকরা অভিজাত হোটেলের সামনে এসে থামল সেটা। রুচিরাকে নামিয়ে হাত ধরে টেনে নিয়ে ভিতরে ঢুকল। দিনটা সেলিব্রেট না করে আজ আর বাড়ি ফিরতে দিচ্ছে না তাকে, আগেই বলেছে। রুচিরা হাঁ করে দেখল, এখানকার কায়দা-দুরস্ত মানুষগুলো সব এই লোকের সুপরিচিত। কোট প্যান্ট টাই পরা একজন ছুটে এল। কি কথা হল রুচিরা জানে না। লিফটে করে দোতলায় নিয়ে গিয়ে সে তাদের ছোট্ট ফিটফাট গালচে বিছানো ঘরে এনে ছেড়ে দিল। ঘরে বড় বড় শৌখিন সোফা সেটি পাতা।

লোকটা চলে যেতে রুচিরা জিজ্ঞাসা করল, এখানে কি?

–এখানে খাওয়াদাওয়া আর আনন্দ।

বলেই দরজাটা জোরে ঠেলে দিয়ে মানুষটা আচমকা যে আনন্দে মেতে উঠল তার জন্য রুচিরা একটুও প্রস্তুত ছিল না।

ওর হাড়-পাজরগুলোও যেন খসে খসে পড়বে! ওই বুকের সঙ্গে ওর বুক পিষে ফেলার আগে যেন ছাড়বে না। এমন চুমু খেয়ে চলেছে যে দম বন্ধ হওয়ার দাখিল। গোটা দেহটা অবশ করে ফেলছে। তারপর পিঠের ওপর অকরুণ দুটো হাতও যেন অবাধ্য হয়ে উঠছে।

শেষে প্রাণপণ চেষ্টায় রুচিরা ছাড়িয়ে নিল নিজেকে দূরে সরে গিয়ে হাঁপাতে লাগল। মাথা ঝিম ঝিম করছে তখনো। ইন্দ্র ব্যানার্জী হাসছে তার দিকে চেয়ে।

–আমি এক্ষুনি চলে যাচ্ছি-এই অসভ্যতা করার জন্য আমাকে এখানে নিয়ে এসেছ?

ইন্দ্র ব্যানার্জীর অবাক মুখ।-এর নাম অসভ্যতা?

আবার এগোচ্ছে ওর দিকে।

–ভাল হবে না বলছি! আমি চলে যাব।

হাসতে হাসতে ইন্দ্র ব্যানার্জী একটা সোফায় বসে পড়ল।

.

দেড় মাসের মধ্যে বিয়েটা হয়ে গেল। বিয়ে ঠিক হবার পর তাড়া ছেলের তরফেরই বেশি। কারণ, ইন্দ্র ব্যানার্জীর বাবার শরীর হঠাৎ বেশি রকম অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। ব্লাডপ্রেসার সর্বদা টঙে উঠে থাকে। কখন কি হয় ঠিক নেই, বিয়ে যখন হবে, আগেই হয়ে যাওয়া ভাল।

এই দেড় মাস সাগ্রহে একটি একটি করে দিন গুনেছে রুচিরাও। এই দেড় মাসের অবাধ মেলামেশায় চিরার বাড়ির দিক থেকেও কোনো আপত্তির প্রশ্ন ওঠেনি। তাই এই সময়টুকুর মধ্যে লোকটার পুরুষকারের ছটা আরও যেন অনেকগুণ বেশি চোখে পড়েছে। তার সঙ্গে তাদের ক্লাবে গেছে, পার্টিতে গেছে, কংগ্রেসের উৎসবে গেছে। ওই লোকের সর্বত্র মাদর। বড় বড় ঘরের মেয়েরা পর্যন্ত তার পিছনে পিছনে। ঘোরে, একটু তোয়াজ তোষামোদ করতে পেলে বর্তে যায়। মদ খাওয়া রুচিরা পছন্দ করে না, দাদা চুপিচুপি মাঝেসাঝে খায় টের পায়। কিন্তু মদ খাওয়ার পর সকলের যে মূর্তি, এর তা নয়। মদ আর জল দুই-ই যেন সমান তার কাছে। চোখ আর মুখ সামান্য লাল হয় শুধু, আর কোনো বিকার নেই, তার পরেও দিব্যি গাড়ি হাঁকিয়ে। বেড়ায় ওকে নিয়ে।

এত সব রূপসী চটকদার মেয়ে থাকতে এই লোক ওর মধ্যে কি দেখল। রুচিরা সময় সময় ভেবে পায় না। দেখে-শুনে মনে হয়েছে, যাকে ডাকত সেই বর্তে যেত।

রুচিরার দিন গোনার আরো একটা কারণ, ভয়। এই মানুষের বেপরোয়া মতিগতির কিছু বিশ্বাস নেই। অভিজাত হোটেলের সেই ঘরে আরো একাধিক দিন ওকে নিয়ে গিয়ে তুলতে চেয়েছে। রুচিরা সরাসরি বেঁকে

বসতে অবুঝের মতো রাগও করেছে। সঙ্গে আরো ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা ছিল বলে একদিন নির্ভয়ে গেছল। হোটেলের ওই ঘরটা যেন এরই দখলে। চাইলেই মেলে–ঘণ্টা দেড় দুই খানাপিনা হৈ-হুল্লোড়ের পর রুচিরা বেশ বুঝল চালাকি করেই অন্য মেয়ে-পুরুষদের জুটিগুলোকে একে একে বিদায় দেওয়া হচ্ছে। বিয়ের তখন মাত্র আর নদিন বাকি। শেষ জুটি বিদায় নিয়ে বেরোবার আগেই রুচিরা উঠে পড়ল। যাবে। গম্ভীর মুখে ইন্দ্র ব্যানার্জী বলল, বিল নিয়ে আসছে, মিটিয়ে দিয়ে বেরুচ্ছি, বসো।

তারপরেই এগিয়ে গিয়ে চোখের পলকে দরজার লক টেনে দিল।

সেই একদিনের মতোই ব্যাপার শুরু হল তারপর। কিন্তু শেষ কোন দিকে গড়াচ্ছে, মতলবখানা কি রুচিরা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে। সেটা চোখেমুখে স্পষ্ট লেখা। কিন্তু এ-দিন আর অপ্রস্তুত ছিল না। জোর করে বার বার তাকে ঠেলে সরিয়েছে। শেষে রেগেই গেছে অবুঝ মানুষটা।

-কেন?

–না।

–না কেন, বিয়ের তো নদিন মাত্র বাকি আর।

রাগ হয়ে যাচ্ছিল রুচিরারও।–সেই কাণ্ডজ্ঞান যদি থাকে তো ওই নদিন আগে তুমি আমাকে ছোঁবে না পর্যন্ত বলে দিলাম!

–আচ্ছা, অবাধ্যতার ফল টের পাবে! প্রচণ্ড রাগ চেপেই ঘর থেকে বেরিয়েছে। ইন্দ্র ব্যানার্জী।

নটা দিন এরপর ভালয় ভালয় কেটেছে। বিয়ে হয়ে গেছে। কিন্তু ফুলশয্যার রাতে ভিতরে ভিতরে বেশ একটু ধাক্কাই খেয়েছে রুচিরা। ভিতরে ভিতরে মানুষটা সত্যি নিষ্ঠুর কিনা ভেবে পায়নি। নদিন আগের সেই অবাধ্যতার জবাব দেবারই যেন রাত এটা। সারাক্ষণ শিকারীর মতো সময় আর সুযোগের অপেক্ষায় ছিল যেন। সেটা মিলতেই ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

তারপর এই দেহটা যেন শুধু তারই বেপরোয়া ভোগের সামগ্রী। এর সঙ্গে আর কারো যেন আনন্দের যোগ নেই। ছিঁড়ে-খুঁড়ে একাকার করে দিয়ে মত্ত উল্লাসে বিস্মৃতির অতলে ডুবে যাওয়ার তাড়না। না বলেও পারেনি।

এ রকম করছ কেন? আমি কি ফুরিয়ে যাচ্ছি যে একেবারে খেয়ে না ফেলা পর্যন্ত শান্তি নেই?

চোখে-মুখে সেই রকমই উল্লাস নিয়ে ইন্দ্র ব্যানার্জী সদর্পে বলেছে, আমার কথা শোননি কেন? আমার অবাধ্য হয়েছিলে কেন?

রুচিরার দিক থেকে প্রথম ফুলশয্যার রাত ব্যর্থ গেছে।

মেজাজ-পত্র তার ঠাণ্ডা হলে কি হত বলা যায় না, মন বুঝে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করলে কি হত তাও বলা যায় না। কিন্তু রুচিরার মনে হত সে-ভাবে চলা মানে একজনের ইচ্ছা-অনিচ্ছার দাসী হয়ে থাকা। পরিচয়ের গোড়ায় যে-ভাবে ফোঁস করে। উঠত, এখনো তার সেই মেজাজ। বিয়ের আগে ইন্দ্র ব্যানার্জীর কাছে তার এই মেজাজ একটা বড় আকর্ষণ ছিল। বিয়ের পরে বউয়ের এই মেজাজ নিজের একচ্ছত্র বশে আনার অহংকারে ঘা পড়লে সেও কড়া দাপটের মানুষ।

প্রথম পনেরো বিশটা দিন তৃষ্ণা যেন মাথায় চেপেই থাকল তার। বেপরোয়া সম্ভোগে কোনোরকম বাধা বরদাস্ত করার পাত্র নয়। কিন্তু মদ খেয়ে এলে রুচিরা সাফ বলে দিয়েছে, ও-সব খেয়ে এদিক ঘেঁষবে না। ব্যস, তারপর আরো বেশি খাবে আর জোর করেই আরো বেশি ঘেঁষবে, দখল নেবে। তারও সাফ কথা, দেখো, আমার ইচ্ছেটাই সব, যখন যেমন চেয়েছি তেমনি হয়ে আসছে, আর তেমনি হবে! তুমি এটা মনে রাখলে ভাল, না রাখলে কিছু এসে যায় না, তবে তাতে তোমারই অশান্তি!

আর এক ব্যাপারে রুচিরা গোড়াতেই সাবধান করে দিয়েছিল। এম. এ. ফাইনাল। পরীক্ষার আগে কোনো ছেলেপুলে নয়। তারও সাফ জবাব, ও তোমার ব্যাপার তুমি ভাববে, সাবধান হতে হয় নিজে হবে–এসব আমার কোষ্ঠীতে লেখা নেই।

গোড়া থেকেই বুকের তলায় ঘা পড়ছিল রুচিরার। কিন্তু এখনো সে ভাবতে চায় না জীবনের সব থেকে বড় ব্যাপারে সব থেকে বড় ভুলটাই সে করে বসেছে। কিন্তু সে-রকম কোনো গণ্ডগোল দানা বেঁধে ওঠার আগেই বাড়ির কর্তা অর্থাৎ রুচিরার শ্বশুর হঠাৎ বেশিরকম অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তখন আবার এই ছেলের মতিগতি অন্যরকম দেখল। রুচিরার বাবার তাঁকে হাসপাতালে পাঠানোর ইচ্ছে ছিল। কিন্তু শ্বশুরের তাতে আপত্তি। ছেলে দুহাতে পয়সা খরচ করে হাসপাতালের সমস্ত সুব্যবস্থা বাড়িতেই করে ফেলল। শাশুড়ী অনেককাল আগেই গত হয়েছিলেন, রুচিরা ভিন্ন বাড়িতে আর দ্বিতীয় মেয়েছেলে নেই। চব্বিশ ঘণ্টার জন্য দুজন নার্স রাখা হল, আয়া রাখা হল। রোগীর অবস্থা যত ঘোরালো হয়ে উঠছে, ইন্দ্র ব্যানার্জীর মনের অবস্থাও তত খারাপ হচ্ছে। দিন-রাত বাপের কাছে বসে থাকে, কারখানায়ও যায় না। পাগলের মতো সাত বার করে রুচিরার বাবার কাছে ছোটে। বাবাকে সারিয়ে তুলতেই হবে -আর কি করা যায়?

সেদিন তো রুচিরার সামনে ওর বাবাকে ধমকেই উঠল প্রায়, একটুও তো সুবিধের দেখছি না, আরো বড় ডাক্তার কে কোথায় আছে ডাকুন!

এই রোগে রুচিরার বাবাই নামজাদা স্পেশালিস্ট। কিন্তু জামাইয়ের মানসিক অবস্থা দেখে কোনো অভিমান না রেখে ভদ্রলোক আরো দুজন নামকরা ডাক্তার নিয়ে এলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না শেষ পর্যন্ত। ওদের বিয়ের আড়াই মাসের মধ্যে শ্বশুর চোখ বুজলেন।

...এই দাপটের ছেলেকে খুন বাপের বুকের ওপর আছড়ে পড়ে কাঁদতে দেখেছে। রুচিরা। একেবারে অসহায় বাচ্চা ছেলের মতো কান্না। রুচিরাই তখন সান্ত্বনা দিয়েছে। তাকে। টেনে তুলতে চেষ্টা করেছে। ওই লোক তখন অকারণে রাগ করলে বা বিরক্ত হলেও ওর সহিষ্ণুতায় ফাটল ধরেনি।

কিন্তু মানুষের চরিত্র যাবে কোথায়? আবার দুমাস যেতে-না-যেতে যে-কে সেই। বাবা ঘরে থাকার দরুন ঘরে যেটুকু সংযম ছিল সেটুকুও গেল। আবার খটাখটি বাধতে লাগল। রুচিরা যদি চুপচাপ দেখে যায়, যা বলে প্রতিবাদ না করে শুনে যায়,তাহলে হয়তো কোনো গোল থাকে না।কিন্তু অন্যায় দেখলে

বা স্নায়ুতে ঘা খেলে রুচিরাও যুঝতে ছাড়বে না। যা বলার সোজাসুজি বলে দেবে। কিন্তু বাধা পেলেই মানুষটার ভিতরে যেন কি বিষের ক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। অন্যায় বা জুলুম বুঝলেও জোর করেই তা করবে। সব কিছুই তখন যেন একটা চ্যালেঞ্জের ব্যাপার হয়ে যায়। উল্টে শাসায়, কারো বাবার ধার ধারি না, ভাল না লাগে চুপ করে থাক, মাস্টারি করতে এসো না।

রুচিরার ধারণা, ও পছন্দ করে না বলেই বন্ধুবান্ধব নিয়ে বাড়িতে বসেই এক-এক সন্ধ্যায় মদ গেলে এখন। রাগ করে রুচিরা বাপের বাড়ি চলে এলে দস্তুরমত শাসায়, এ-ধরনের অবাধ্যতা বরদাস্ত করার ধাত নয় তার। সেই মত্ত অবস্থাতেই এক-এক রাতে জোর করে দখল নিতে আসে। নেয়ও। ও কিছুতে আপত্তি করলেই সেটা আরো বেশি করে করার দুরন্ত ঝোঁক চাপে লোকটার। এমন কাণ্ড করে যে রুচিরার মাথা খারাপ হবার দাখিল এক-একসময়।

তার স্তাবকের সংখ্যা আরো অনেক বেড়েছে। আড্ডায় বসে গেলে কারখানা কামাই করে। বলতে গেলে ঝাঝালো জবাব দেয়, আমি কারখানায় যাই বা না যাই তোমার তাতে কি?

অবশ্য রুচিরা যখন বলতে যায় তখনো সেটা একেবারে শ্লেষশূন্য হয় না। এদিকে কোথা থেকে তাড়া তাড়া নোট আসছে, রুচিরা ভেবে পায় না। ওড়াচ্ছে, ফুর্তি করছে। কিছু বলতে গেলেই দাবড়ানি। কিন্তু বলার যা রুচিরাও বলবেই। আরো খারাপ লাগে। যখন সাঙ্গোপাঙ্গর মারফত একে-ওকে হুমকি দিয়ে পাঠায়। রুচিরা বলে, এটা কি মগের মুলুক নাকি?

সে হেসে জবাব দেয়, মগের মুলুক কিনা দেখছ না?

রুচিরার ভিতরটা বিষিয়েই যেতে থাকল। মনের অবস্থা এমন দাঁড়াল যে সে বছর আর তার এম. এ. পরীক্ষাই দেওয়া হল না। হেসে হেসে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে ছড়াল ইন্দ্র ব্যানার্জী। বলল, ভালই হল, এই বিদ্যের ঝঝেই অস্থির আছি।

মেয়ে কেমন আছে রুচিরার বাবা-মায়ের কাছেও সেটা গোপন থাকল না। একদিন জামাইকে এ নিয়ে দুকথা বলতে এসে বাবা দস্তুরমতো অপমানিত হয়ে ফিরে গেলেন।

গোঁ ধরে রাতে এক-একদিন বাড়িই ফেরে না ইন্দ্র ব্যানার্জী। রুচিরা একদিন কটুক্তিই করে উঠেছিল। জবাবে সে বলেছে, হোটেলের সেই একটা ঘর তো তুমি চেনো, সে-ঘরে তোমার আগেও মেয়ে এসেছে, এখনো আসে–বুঝলে?

শুনে রুচিরা স্তব্ধ। তখন থেকেই পরিত্রাণের রাস্তার কথা ভাবতে লেগেছে কিনা বলা যায় না। এর কিছু দিনের মধ্যে শেষ ঘনাল সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার নিয়ে।

যে-বাড়িতে থাকে তার ভাড়া মাসে ছশো। এখন এ-বাড়ি ছাড়লে ভাড়া তার ডবল হবে। শ্বশুর থাকতে কখনো বাড়িভাড়া বাকি পড়েনি। কিন্তু এখন চার মাসের ভাড়া বাকি। বার কয়েক লোক পাঠিয়ে বয়স্ক বাড়িঅলা নিজে এসেছেন ভাড়ার তদবির করতে।

তাকে দেখেই ইন্দ্র ব্যানার্জী খাপ্পা-লোক পাঠিয়ে উত্যক্ত করছেন, এখন নিজে এসেছেন ভাড়া আদায় করতে, কেমন? যান, দেব না–হিম্মত থাকে কোর্টে গিয়ে ভাড়া আদায় করুন।

শুকনো পাংশু মুখে ভদ্রলোক চলে যেতেই লজ্জায় অপমানে রুচিরা ঝলসে। উঠল।–এ-সবের মানে কি আমি জানতে চাই! এদিকে টাকা ওড়াচ্ছ, ফুর্তি করছ, আর চার মাস ভাড়া দাওনি লজ্জা করে না? নিজে দোষ করে আবার ছোটলোকের মতো ভদ্রলোকের ওপর হম্বি-তম্বি করছ?

ছোটলোকের মত শুনেই ইন্দ্র ব্যানার্জীর মাথায় রক্ত উঠে গেল। মুখের সামনে এগিয়ে এসে দাঁড়াল। চোয়াল দুটো এটে বসল।–কি বললে?

–কি বললাম তুমি শোননি?

–শুনেছি। আর একবার বল তো?

–বললে তুমি কি করবে?

–একটা একটা করে ওই দাঁতগুলো খুলে নেব।

রুচিরা থমকাল। তক্ষুণি মনে হল, পারে। এও পারে।

দুপুরে সে বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রুচিরা নিজের ট্রাঙ্ক গোছাল। গয়নাপত্র সব বার করে নিল। তারপর একটা ট্যাক্সি ডেকে সোজা বাপের বাড়ি।

তারপর দিন গেছে, মাস গেছে, একে একে দুটো বছর ঘুরেছে। ওই এক মানুষকে নিয়ে এই বাড়িতে, এ-বাড়ির রাস্তায় অনেক ঝড় বয়ে গেছে। হুমকি শাসানি আর শেষ পর্যন্ত বোমাবাজীর ভয় পর্যন্ত দেখানো হয়েছে।

গোঁ রুচিরার বাবারও কম নয়। নামী ডাক্তার, পাঁচজন হোমরা-চোমরা মানুষ খাতির করেন তাকেও। তাদের সহায়তায় বোমাবাজীর হাত থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন। বাড়িতে তবু বাড়তি দরোয়ান রাখতে হয়েছে। রুচিরাকেও একলা কোথাও বেরুতে দেওয়া হয়নি।

এদিকে কেস চলেছে। জোর ও-তরফেরও কম নয়। বিচ্ছেদের মামলা আনা হয়েছিল রুচিরা স্বামীর ঘর ছাড়ার পাঁচ মাস বাদে। কোর্টের রায় বেরুতে আরো ন-দশ মাস!

সব মিলিয়ে সাতাশ মাসের একটা অধ্যায় শেষ। এর পরেও হামলা হত কিনা বলা যায় না। কিন্তু দেশের হাওয়া রাতারাতি বদলেছে। দিল্লীর শাসন-ক্ষমতা জনতার হাতে এসেছে গত মার্চের শেষে। এখানকার এতদিনের ডাকসাইটে পাণ্ডাদের মাথায়ও আচমকা বজ্রাঘাত ঘটে গেছে যেন। এপ্রিলের এই গোড়াতেই কোর্টের রায় বেরুল।

.

এক বছর বাদ গেছে, তার পরের বছরেই এম. এ. পাস করে ঘরে বসেছিল। রুচিরা। এতদিন সাহস পায়নি, এখন একটা কাজ-টাজ দেখে নেবার ইচ্ছে। নইলে সময় কাটে কি করে?

কিন্তু মুক্তি পাওয়ার পর কোথা থেকে যে রাজ্যের ক্লান্তি এসে ঘেঁকে ধরেছে তাকে কে জানে। কিচ্ছু ভাল লাগে না। ওই দাপটের মানুষের এখন আর কোনো সাড়াশব্দ নেই। কেউ আর কেয়ার করে না তাকে। শুনেছে, বাড়িঅলাও এবার তার বিরুদ্ধে কেস ঠুকে দিয়েছে।

দিদির আবার মতলব, সুশীতলের সঙ্গেই এবার তার বিয়েটা হোক। এ-পর্যন্তও সে বিয়ে করেনি। দিদি প্রায়ই বোনের মন বুঝতে আসে। কিন্তু রুচিরা কি বলবে? নিজের মনের হদিস নিজেই ভাল পায় না।

সুশীতল চক্রবর্তী নিজেই এল একদিন। রুচিরার হাঁস-ফাস দশা। কথা উঠলে কি বলবে জানে না।

কিন্তু নরম করে সুশীতল যে-কথা বলল, এ-রকমটা শোনার জন্যও প্রস্তুত ছিল। বলল, দেখ তোমার দিদির একটা মতলব টের পাচ্ছি। সেই জন্যই তোমাকে দুটো কথা বলতে এলাম, নইলে তুমি ভাববে হয়তো আমার ইচ্ছে বুঝেই তিনি এই মতলব করছেন। কিন্তু আমি তোমাকে সত্যি কথা বলছি, আমি এতে রাজী নই…আমার মতো মানুষকে ভালবাসতে পারলে তুমি আগেই বাসতে। তুমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস। করেই একজনকে ভালবেসে তার ঘরে গেছলে। যা হয়ে গেল সেটা দুর্ভাগ্য, সেটা তোমার ভালবাসার দোষ নয়। এই দুর্ভাগ্যের সুযোগ নিয়ে আবার আমি এগিয়ে এসে ভালবাসার দাবী করব–এটা বোধহয় আরো বেশি ভুল হবে। আমি বরং প্রার্থনা করব, যে ধাতের মানুষকে তুমি ভালবাসতে পার সে-রকম একজনকেই যেন পাও।

সুশীতলের কথাগুলো অনেক ভেবেছে রুচিরা। প্রতিটি কথা যে সত্যি সে আর ওর থেকে বেশি কে অনুভব করতে পারে?

ডিভোর্সের দেড় মাসের মধ্যে বাবা হঠাৎ হার্ট অ্যাটাকে মারা গেলেন। এতবড় ডাক্তার, নিজের কোনো রকম চিকিৎসার সুযোগটুকুও দিলেন না।

রুচিরার আরো বুক ফেটে কান্না এল যখন জানতে পারল বাবা এর আগেই ওর জন্য ভবিষ্যতের কি ব্যবস্থা করে গেছেন। তাঁর উইলে বাড়ির দু ভাগ দাদা আর দিদির, একভাগ রুচিরা আর মায়ের। এ ছাড়া শুধু রুচিরার জন্য ব্যাঙ্কে রেখেছেন নগদ দু লক্ষ টাকা। না, রুচিরাকে খাওয়া-পরার ভাবনা ভবিষ্যতে কোনোদিন ভাবতে হবে না।

কিন্তু দিন-রাতই ভাবছে। বাবার কাজ-কর্ম চুকে যেতে শোকতপ্ত মাকে নিয়ে বেশ কিছুদিনের জন্য বাইরে বেরিয়ে পড়ল সে। কারণ বাবা থাকতে মায়ের মুখের একটা খেদ সে অনেকবার শুনেছে। জীবনে এ-পর্যন্ত এক কলকাতা ছাড়া আর কোনো তীর্থের জায়গা দেখা হল না। তীর্থের টান রুচিরার একফোঁটাও নেই, কিন্তু এখানে যেন দম বন্ধ হয়ে আসছিল তার। মা তীর্থ করুক, ওর ঘুরে বেড়ানোটাই লাভ।

কাশী মথুরা বৃন্দাবন সেরে দিল্লী হয়ে হরিদ্বারে এল তারা। ফেরার তাড়া কিছু নেই। প্রায় দুটো মাস কেটে গেছে। হরিদ্বারে দিন পনেরো থাকবে। মাঝে ঋষিকেশ লছমনঝোলা যাবে, দেরাদুন আর মুসৌরিটাও ঘুরে আসবে। রুচিরার এই ভেসে বেড়ানোর মতো ব্যাপারটা ভাল লাগছিল। তীর্থের টান থাক না থাক, প্রকৃতির সঙ্গে বুকের তলায় কোথায় একটা বড় যোগ আছে, সেটা বেশ অনুভব করা যাচ্ছিল।

হরিদ্বারে এসে মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ একজনের। লোকটা সাধু-সন্ন্যাসী কিনা। জানে না। পরনে ধপধপে সাদা থান, গায়ে সাদা ফতুয়ার ওপর সাদা চাদর। লম্বা দোহারা চেহারা, গায়ের রং ফর্সা নয়, তামাটে। মাথার চুলে কদমছাট। দাড়ি-গোপ কামানো পরিষ্কার হাসি-হাসি মুখ। বছর বত্রিশ-তেত্রিশের মধ্যে বয়েস।

প্রথম দেখা হর কী পিয়ারীর ঘাটে। জনাকতক আধবয়সী মেয়ে-পুরুষ ঘিরে। দাঁড়িয়েছিল তাকে। হাত নেড়ে হাসিমুখে তিনি সামনের আছাড়ি-পিছাড়ি গঙ্গাকে দেখিয়ে কি বলছিলেন। এর মধ্যে নতুন যারা আসছে তারা

সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করছে। তাকে। কে প্রণাম করছে না করছে ভদ্রলোক তাও খেয়াল করছিলেন না।

মায়ের সঙ্গে একটু দূরের উঁচু ধাপে দাঁড়িয়েছিল রুচিরা। কথা বলতে বলতে মানুষটির হঠাৎ এদিকে চোখ পড়ল। দূর থেকেও রুচিরার মনে হল চোখ দুটো ভয়ানক ঝকঝকে। আর তার থেকে যেন একটু হাসির আভাস ছিটকে বেরোয়। রুচিরা অন্য দিকে মুখ ফেরাতে যাচ্ছিল। কিন্তু এবারে মনে হল অপলক চোখে ভদ্রলোক এখন মাকে দেখছেন। তাকে ঘিরে যারা ছিল, এই দেখাটা তাদেরও চোখে পড়েছে। তারাও এ-দিকে ঘুরে তাকাচ্ছে।

তাদের সরিয়ে মানুষটি হঠাৎ এদিকে আসতে লাগলেন। রুচিরা ভেবে পেল না কি ব্যাপার। কাছে এসে হেসে মাকে বললেন, মাসিমা, চিনতে পারেন?

মা হকচকিয়ে গেলেন। দূর থেকে আগে মা-ও একে দেখেছেন আর মস্ত কোনো সাধু-টাধু ভেবে বসেছিলেন। মাসিমা ডাক শুনে তার হতচকিত হবার কথাই।

উনি হেসে বললেন, চিনতে পারলেন না তো, আপনাদের কলকাতার সেই উমাদিদির ছেলে শঙ্কর–মনে পড়ছে না?

মায়ের সমস্ত মুখে যে বিস্ময়ের আঁচড়গুলো পড়তে থাকল রুচিরা তা ঠিকই লক্ষ্য করছে। মা যেন ঠিক ধরতে-ছুঁতে পেরেও পারছেন না। তারপরেই মনে পড়ল। ব্যগ্র মুখে বললেন, সেই ঈশ্বর গাঙ্গুলী রোডের আমাদের পিছনের বাড়ির উমাদি? উমা চ্যাটার্জী?

হেসে মাথা নাড়লেন।-এবারে চিনেছেন? দেয়াল টপকে আপনাদের বাড়ি গিয়ে কত দৌরাত্ম করেছি, যখন-তখন খেতে চেয়েছি, মনে পড়ে? আমি তো এই বাইশ বছর বাদেও আপনাকে দেখেই চিনে ফেললাম।

মায়ের মুখখানা যেন হঠাৎ ব্যাকুলতায় ভরে গেল একেবারে।-হ্যাঁ বাবা চিনেছি। –কিন্তু তুমি এখানে আছ, উমাদি জানেন? তুমি তাদের সঙ্গে

যোগাযোগ করেছ? উমাদি কি এখনো ঈশ্বর গাঙ্গুলী রোডের সেই বাড়িতেই আছেন?

মানুষটি হাসছেন। চোখ দুটো আশ্চর্য ঝকঝকে বটে। একবার রুচিরার দিকে তাকালেন। মনে হল ওই দুটো চোখের,একটা বিদ্যুৎ-তরঙ্গ বুঝি গায়ে এসে লাগল। হঠাৎ কেন যে একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগল রুচিরা জানে না।

-মা দুবছর আগেই গত হয়েছেন। আমি তখন বাইরে। আর সব ও-বাড়িতেই। আছেন।

ব্যাকুল মুখে মা বলে উঠলেন, সেই বিশ বছর বয়সে ঘর ছেড়ে চলে গেছলে, এতকালের মধ্যে তোমার মায়ের সঙ্গে আর দেখাই হল না?

–মা মারা যাবার সময় আমি তার কাছেই ছিলাম।

রুচিরার মনে হল তার মা যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। একটা ব্যাপারে একটু অবাকই লাগল। মা বলছেন বিশ বছর বয়সে ঘর ছেড়েছে, আর ইনি একটু আগে বললেন, বাইশ বছর বাদেও দেখেই মাকে চিনেছেন–মানুষটির বয়েস কি তাহলে বাইশ আর কুড়ি বিয়াল্লিশ এখন? মুখ দেখলে এর কাছাকাছি মনে হয় না।

রুচিরার মা বললেন, যাক, তবু তাহলে মাকে শেষ সময়ে শান্তি দিতে পেরেছ। একটু। বলা নেই কওয়া নেই, বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে আর উমাদি একেবারে পাগলের মতো হয়ে গেল–দেখে আমাদের চোখে জল আসত। মাকে এভাবে কষ্ট দিয়ে কি যে পুণ্য হয় আমি বুঝি না।

হাসিমুখেই মাথা নাড়লেন ভদ্রলোক। বললেন, পুণ্য হয় না।

তার পরে ঘুরে তাকালেন রুচিরার দিকে। গভীর, একেবারে ভেতর দেখে নেবার মতো চাউনি। এমন যে, রুচিরার মনে হতে লাগল গায়ে যেন যথেষ্ট আবরণ নেই। একটু বাদে মায়ের দিকে ফিরলেন আবার। জিজ্ঞাসা করলেন, মেয়ের বিয়েটা বুঝি সুখের হল না?

শোনার সঙ্গে সঙ্গে রুচিরা চমকেই উঠল। মাও প্রথমে হতভম্ব, তারপরে ব্যাকুল।–তুমি দেখে বুঝলে বাবা? তুমি সেই শঙ্কর–না কোনো মহাপুরুষ তুমি?

হাসছেন।–আমি মহাপুরুষ-টুরুষ কিছু নই মাসিমা।

-না না। ও-সব আমি শুনছি না, তুমি সব জান, সব বুঝতে পার, নইলে তুমি জানলে কি করে? তুমি বল ওর কি হবে? ওর অদৃষ্টে কি আছে? ওর কথা ভাবলে আমার প্রাণটা একেবারে শুকিয়ে যায়।

এর মধ্যে একজন লোক এসে তার কানের কাছে মুখ এনে কি বলতে মাথা নেড়ে তিনি আবার মায়ের দিকে ফিরলেন।–আপনি বিশ্বাস করুন মাসিমা, আমি কিছু জানি না, ও-সব বিদ্যে আমার নেই। আমার ওখানে একদিন এলে খুশী হব। মিশনে লোক এসেছেন, এখন আমি যাই

মিশনের নাম এবং হদিস বলে দিয়ে চলে গেলেন।

মা ব্যাকুল চোখে সেদিকে চেয়ে রইলেন।

.

ধরমশালার তিনতলায় একটা সুইট ভাড়া করে মাকে নিয়ে উঠেছিল রুচিরা। ঘরে ফিরে দু-চার কথায় মায়ের কাছে ব্যাপারটা শুনে নিল। উমাদি বলতে মায়ের সত্যি সম্পর্কের কেউ নয়। শঙ্করের বাবা ছিলেন উকিল, কিন্তু খুব পসার ছিল না। রুচিরার বাবা মা-ও তখন ঈশ্বর গাঙ্গুলী রোডে এক ছোট বাড়িতে থাকতেন। রুচিরার মনে থাকার কথা নয়, কারণ তার তখন মাত্র বছর তিন-চার বয়েস। সেই বাড়ির ঠিক পিছনে ছোট একটা ভাঙা পৈতৃক বাড়িতে উমাদি আর অনেকগুলো মেয়ে আর এই একটা ছেলেকে নিয়ে থাকতেন সেই উকিল ভদ্রলোক। এই ছেলেটা সত্যি খুব দুরন্ত আর খেয়ালী ছিল। রুচিরার মায়ের কাছে যখন-তখন আসত, খেতে চাইত। ওদের বিশেষ করে রুচিরাকে নিয়ে নাকি লোফালুফি খেলত। তাই দেখে রুচিরার বাবা নাকি একদিন খুব বকেও দিয়েছিলেন তাকে। শঙ্কর নিজের

মাকে আর রুচিরার মাকেও এক-এক সময় বলত, বেশিদিন সে আর এ সংসারে থাকছে না–তার ভাল লাগে না। কিন্তু তার সে-কথায় কেউ কান দিত না। রুচিরার মা ভাবতেন অভাবের সংসারে ভাল খেতে পরতে পায় না বলেই এ সব কথা বলে।

কিন্তু বি. এ. পরীক্ষা দিয়ে সত্যিই আর সে ঘরে থাকল না। দু-লাইনের এক চিঠিতে মাকে তার জন্য ভাবতে বারণ করে কোথায় যে চলে গেল কেউ জানে না। ভালমানুষ উমাদির অনেকগুলো মেয়ে আর ওই একটাই ছেলে। সে পাগলের মতো হয়ে গেল। এর বছর দেড়েকের মধ্যে রুচিরার বাবা-মা ও-বাড়ি ছেড়ে অন্য বড় বাড়িতে উঠে আসেন। আরো বছর দুই-তিন যাতায়াত ছিল। কিন্তু তখনো উমাদি ছেলের কোনো খবর পায়নি। এরপর রুচিরার বাবা এখনকার এই বাড়ি করে উঠে আসেন। তারপর থেকে আর যোগাযোগ ছিল না।

রুচিরার মায়ের মনে কি আশা কে জানে। পরদিনই বিকেলে সেই মিশনের উদ্দেশ্যে ছুটলেন। রুচিরার সঙ্গে না গিয়ে উপায় নেই। মাকে একলা ছেড়ে দেওয়া যায় না। দেড় মাইলের মধ্যে সেই মিশন। টাঙ্গাঅলাকে বলতে সে-ই নিয়ে গেল। বিরাট এলাকা, বিশাল ব্যাপার। সেখানে সাধন-ভজন ছাড়াও সেবাব্রত একটা বড় কাজ বোঝা গেল। ভিতরে ডিসপেনসারি, হাসপাতাল। পয়সা দিয়ে পড়তে পারে না এমন। ছেলে-মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থাও আছে।

ঝকঝকে মস্ত একটা হলঘরে বক্তৃতার আসর বসেছিল। শঙ্কর চ্যাটার্জীর খোঁজ করতে ওদের সেখানে নিয়ে যাওয়া হল। অনেক বিদেশীর সমাগম ঘটেছে সেদিন। আর বহু গেরুয়া-পরা সাধুও বসে। বিদেশাদের কারণেই হয়তো ইংরেজিতে বক্তৃতা করছেন শঙ্কর চ্যাটার্জী। বিশুদ্ধ উচ্চারণ বলার সাবলীল ভঙ্গি। সকলে একাগ্র মনে শুনছেন। ধর্মীয় দর্শনের কিছু একটা ব্যাখ্যা চলেছে। রুচিরার ভাল লাগছে। কান। পেতে শুনতে এবং বুঝতে চেষ্টা করল সেও।

বক্তৃতার পরে মা সেদিন আর তাকে নিরিবিলিতে পেলেন না। কারণ এর পরেই তার অন্যত্র কোথায় যাবার কথা। তবু হাসিমুখে সামনে এসে দাঁড়ালেন একটু। মায়ের সঙ্গে পাঁচ-সাত মিনিট কথা বললেন। রুচিরা একটু দূরে দাঁড়িয়ে। বার কয়েক ওকেও ঘুরে দেখলেন তিনি। কিন্তু রুচিরার সেই আগের দিনের গঙ্গার ঘাটের মতোই অস্বস্তি। তাকালেই ভদ্রলোক যেন বড় বেশি দেখতে পান। পুরুষের এই দেখাটাকে রুচিরা খুব যেন বিশ্বাস করে উঠতে পারে না।

পরদিন সকালে টাঙ্গা নিয়ে মা একলাই চলে গেলেন সেখানে। রুচিরাকে ডাকতে সে স্পষ্ট বলে দিল তার ভাল লাগছে না। ঘণ্টা দুই বাদে মা ফিরে ওই লোকের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সকালেও উনি কোথায় চলে গেছলেন বলে মায়ের ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করতে হয়েছিল। সেই সময় এক বুড়ো সাধুর সঙ্গে মায়ের অনেক কথা হয়েছে। তাঁর মুখে মা শুনেছেন, শঙ্কর চাটুজ্যে সাধু-টাধু কিছু নন কিন্তু এখানকার সব সাধুরাই তাকে বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা করেন। তারা তাকে পরম সমাদরে ওখানে রেখেছেন, কখন হুট করে আবার চলে যান সেই ভাবনা সকলের। ভদ্রলোক টানা ষোল বছর বিদেশে কাটিয়েছেন। পৃথিবীর বহু জায়গায় ঘুরেছেন। এই আশ্রমের সঙ্গে তার যোগ পাঁচ বছরের, তার মধ্যেও দু-বার কাউকে কিছু না জানিয়ে একবার এক বছর আর একবার ন-মাসের জন্য কোথায় চলে গেছলেন। আধ্যাত্ম জগতের শিক্ষিত মানুষেরা এখানে। এলে তার কথা, তার ব্যাখ্যা শোনার জন্য ছুটে আসেন। সেই জন্যেই সপ্তাহে একদিন করে এক একটা বিষয়ের ওপর তার বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। আগের দিন সেই বক্তৃতাই তারা শুনে গেছল। অন্যান্য দিন এখানকার সাধুদের তিনি এক ঘণ্টা দু ঘন্টা করে দেশ-বিদেশের দর্শনশাস্ত্র পড়ান। সাধুরাও তাকে তেমনি ভক্তি-শ্রদ্ধা করেন।

এর পর শঙ্কর চ্যাটার্জীর সঙ্গে মায়ের দেখা হয়েছে, এক ঘণ্টা ধরে অনেক কথা হয়েছে। তার কথা শুনলে নাকি কান-মন জুড়িয়ে যায়। মায়ের মুখখানা আনন্দে বিহ্বল। ঠিক কোন প্রত্যাশায়, রুচিরা ঠাওর করতে পারল না। মা যে গলগল করে ওই লোকের কাছে মেয়ের সর্ব দুর্ভাগ্যের কথা বলে এসেছেন তাতেও কোনো সন্দেহ। নেই। ওর প্রসঙ্গে উনি নাকি হেসেই

মাকে বলেছেন, আপনার মেয়ে আমাকে ঠিক পছন্দ করতে পারছে না তাই আসেনি।

রুচিরা কেন যেন তেতে উঠল হঠাৎ।–কি-রকম পছন্দ করতে হবে তাকে?

মা থতমত খেলেন। তারপর ধমকের সুরে বললেন, মহাপুরুষদের নিয়েও কি ভাবে যে কথা বলিস ঠিক নেই। বিকেলে তোকে নিয়ে যাব বলেছি।

-কেন? মহাপুরুষদের কাছ থেকে কি আশা কর তুমি? কি করবেন?

মা জবাব দিলেন, কেন রাগ করিস বুঝি না। মায়ের ভাবনা জানিস না?...এরা কত কি দেখতে পায়, বোঝে, হয়তো তোর ভাল হবে এমন কিছু বলে দেবে–নইলে এদের কাছে মানুষ ছুটে ছুটে আসে কেন?

রুচিরা আর কিছু বলল না। নিজের জ্বালায় রাগ করে। নইলে ওই লোকটি সম্পর্কে মায়ের মুখে শোনা বৃদ্ধ সাধুর কথাগুলো ভারি ভাল লেগেছে। সেদিনের। বক্তৃতার অংশ মা হয়তো বোঝেনি, কিন্তু যেটুকু শুনেছে তাতেই ওর মনে দাগ পড়েছে। অসাধারণ কিছু আছেই ওই লোকের মধ্যে, নইলে এ-ভাবে কেউ জীবন কাটাতে পারে না। আশ্চর্য, আজ সেখানে যাবার জন্য দুপুর থেকে ও নিজেই কিরকম একটা তাগিদ অনুভব করছে। ওই লোকের চোখ দুটোকে কেমন ভয়-ভয় করে, আবার। টানেও যে খুব সেটা অস্বীকার করার উপায় নেই।

বিকেলে একটুও আপত্তি না করে মায়ের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল। আশ্রমের। আঙিনায় পা ফেললে মনটা আপনা থেকে খুশী হয়। এখানে-ওখানে পরিচ্ছন্ন বাগান। গাছ-গাছড়া। মালি কাজ করছে, সঙ্গে দু-চার জন সাধুও। অদূরের হাসপাতালের দিকে সাধু আর লোকজনের যাতায়াত বেশি। এই পরিবেশের ভারী একটা আকর্ষণ আছে।

মা শঙ্কর চ্যাটার্জীর ঘর চেনেন। ওকে নিয়ে সোজা সেদিকে চললেন।

ভদ্রলোক দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। একমুখ হেসে এগিয়ে এসে সমাদরে ওদের ঘরে নিয়ে এলেন। পরিচ্ছন্ন ঘর। দেয়ালে কোনো

দেবদেবীর ছবি নেই। কাঠের চৌকির ওপর পাতলা শয্যা বিছানো। সামনে খান-দুই মোড়া।

মা রুচিরাকে বললেন, প্রণাম কর

রুচিরা বিব্রত মুখে দাঁড়িয়ে গেল। ওই ঝকঝকে চোখে চোখ পড়তে ভদ্রলোক হেসেই বললেন, কেন ওকে ব্যস্ত করছেন মাসিমা-আপনি বরং আশ্রমটা একটু ঘুরে টুরে দেখে আসুন, অনেক দেখার আছে–আমি ততক্ষণ দিদির সঙ্গে একটু গল্প করি।-বোসো দিদি, তুমি বোসো

দিদি শুনেই রুচিরার মনে হল মানুষটি যেন ওর মনের তলার কোনো সংশয়ের জবাব দিলেন। মা কিছু একটা আশা নিয়েই আশ্রম দেখার জন্য ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন।

রুচিরা তাকাল তার দিকে। সেই ঝকঝকে চোখ। হাসছেন। কিন্তু আপনা থেকেই এখন সমস্ত সংকোচ ধুয়ে-মুছে যাচ্ছে রুচিরার। মানুষটির চোখে মুখে হাসিতে যেন জাদু আছে। অদ্‌ভুত ভাল লাগছে।

এগিয়ে এসে প্রথমে পা ছুঁয়ে প্রণাম করল, তারপর মোড়ায় বসল।

চৌকিতে বসে শঙ্কর চ্যাটার্জী বললেন, তোমার মায়ের মুখে সব শুনলাম। বড় দুঃখের কথা। ভাল ভাবে এম. এ. পাস করেছ শুনলাম; কোনো মেয়ে-কলেজে কাজ-টাজ দেখে নাও না।

হঠাৎ একটু আগ্রহ নিয়েই রুচিরা বলল, আপনাদের এই সব জায়গায় আমরা কোনো কাজ-টাজ করতে পারি না?

হেসে বললেন, পার, কিন্তু তাতে অন্যের কাজ পণ্ড হবে।

–কেন? মেয়ে বলে?

শঙ্কর চ্যাটার্জী হাসিমুখে মাথা নাড়লেন। তাই।

এই সংস্রবে এটুকু সময়ের মধ্যে রুচিরা প্রায় মুখরা হয়ে উঠল কি করে জানে না। বলল, সাধুরা তাহলে কিরকম সাধু?

হাসছেন।–শরীর ধরলে কেউ সবটা সাধু নয়, আবার সবটা অসাধু নয়। যখন যার চাষ হয় সে বাড়ে। খাঁটি দুধও জলে ফেললে মিশে যায়, মাখন তুলে সেটা ফেললে জলে ভাসে। সাধুদের বেশির ভাগ মাখন হতে চাইছেন, হননি এখনো। হলে পরে ভয় থাকে না।

সহজ কথা। কিন্তু নিগূঢ় তাৎপর্য আছে। রুচিরা তবু ফস করেই জিজ্ঞাসা করে। বসল, আপনার কোন অবস্থা?

জোরেই হেসে উঠলেন শঙ্কর চ্যাটার্জী। বললেন, তুমি বড় সাদা মনের ভাল মেয়ে দিদি, তোমার এরকম বরাত হবার কথা নয়। আমি একটা রক্ত-মাংসের মানুষের ঢেলার বেশি কিছু নয়।

-রক্ত-মাংসের মানুষ হলে কেউ মাকে ছেড়ে পালায়?

হাসতে লাগলেন। তারপর বললেন, এটা একটা নেশা। নেশায় পেয়ে বসলে কে আর বাপ-মা মানছে?

এই মানুষ নিজের প্রসঙ্গে কিছু বলবেন না রুচিরা বুঝে নিল। কিন্তু সত্যি ভাল লাগছে তার, হালকা লাগছে। বলল, মায়ের খুব বিশ্বাস আপনি আমার জন্য কিছু করতে পারেন, কিছু দৈব অনুগ্রহও পাইয়ে দিতে পারেন।

হেসে মাথা নাড়লেন।-না, আমি সে রকম ম্যাজিক কিছু জানি না।

-না জানলে আমার বিয়ে সুখের হল না, গঙ্গার ঘাটে আমাকে দেখেই সে কথা বললেন কি করে?

এবারে অবাক একটু। তার পরেই আবার হাসি।–ও, এই জন্যে তোমরা একটা কিছু ভেবে বসে আছ? বছর তিন সাড়ে তিন আগে মাকে দেখতে যখন কলকাতায় গেছলাম, এক রাস্তায় তোমার দাদা সঞ্জয়ের সঙ্গে হঠাৎ দেখা আমার। সে চেনেনি, আমি চিনেছি। তাকে খবর জিগেস করতে সে

বলেছিল, তোমাদের দু বোনেরই বিয়ে হয়ে গেছে। তা আমার পোশাক-আশাক দেখে সেও আমাকে তোমার মতোই ভণ্ড-টণ্ড কিছু ভেবে সরে গেছল। তেমন পাত্তা দেয়নি।

মানুষটার সরলতা দেখে রুচিরা মুগ্ধ হল, আবার লজ্জাও পেল একটু। সরল না হলে বিয়ে সুখের হল না বলার কৃতিত্বটুকু নিজেই নিত। আর লজ্জা পেল কারণ, গঙ্গার ঘাটে প্রথম দেখে সত্যিই অস্বস্তি বোধ করেছিল। তবু জিজ্ঞাসা করল, দাদার মুখে বিয়ের খবর শুনতে পারেন, কিন্তু সুখের হল না জানলেন কি করে?

-এটা জানা যে সহজ সে এখন তুমি নিজে ভাবলেই বুঝতে পারবে। যাক, তোমাকে আমার বড় ভাল লেগেছে দিদি, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

রুচিরা আবার কেন একটু অস্বস্তি বোধ করছে জানে না। মাথা নাড়ল।

-তোমার মত মেয়েও একটা লোককে ধরে রাখতে পারল না, ফেরাতে পারল না, এটা ভাবতে আমার কষ্ট হচ্ছে। কেন পারলে না? চেষ্টা করেছিলে?

রুচিরার ভিতরটা হঠাৎই তেতে উঠল।–তাকে জানলে আপনি এ কথা বলতেন না।

শঙ্কর চ্যাটার্জী চুপ করে রইলেন। কিন্তু মুখ দেখে মনে হল ঠিক অনুমোদন করতে পারলেন না যেন।

-আপনার বিশ্বাস হল না?

–না।

রুচিরা প্রায় তীক্ষ্নস্বরে বলে উঠল, কেন? আপনি তার কতটুকু জানেন?

-একটুও জানি না। শান্তমুখেই বললেন, কিন্তু সামনা-সামনি কাউকে দেখলে আমি তার অনেকটা ভেতর দেখতে পাই। তাছাড়া তোমার মায়ের

কাছেও অনেক কথা শুনেছি।...তুমি সোনার মেয়ে। সোনা গড়িয়ে গহনা করা যায়, আবার ডাণ্ডা বানিয়ে তা দিয়ে ঘা দিলেও আঘাত লাগে। আমি ভাবছি সে-রকম কোনো ভুল হয়ে গেল কিনা।

কথাগুলি সুন্দর, কিন্তু একটা দুর্বল জায়গায় আবার ঘা পড়ল রুচিরার। বলল, আপনি তাকে জানলে এ-কথা একবারও বলতেন না।

এখন আর হাসছেন না। ঝকঝকে চোখ দুটো ওর মুখের ওপর আটকে আছে। বিয়ের আগে ইন্দ্রর সঙ্গে কতদিন মিশেছিলে?

নামটা মায়ের কাছে শুনে থাকবেন। জবাব দিল, এক বছর।

-এই এক বছরে তার মধ্যে যা দেখে তোমার ভাল লেগেছিল, যা দেখে তাকে তুমি ভালবেসেছিলে–সেটা মিথ্যে হতে পারে না। তোমার চোখে পড়া মনে ধরার মতো তার মধ্যে কিছু ছিলই–সেও মিথ্যে হতে পারে না। একটু আগে তোমাকে বলছিলাম, শরীর ধরলে কেউ সবটা ভাল নয়, আবার সবটা মন্দও নয়, যখন যেটা চাষ হয় সেটা বাড়ে। তুমি ভালটা দেখেছিলে, মন্দটা দেখনি। সেই মন্দের ছায়াটা দূর করতে হলে অহংকার আর অভিমান ছেড়ে তারই ভালর আলোটুকু সব থেকে জোরালো করে তুলতে হয়। আমার ভুল হতে পারে, তোমার অভিমানে ধা পড়েছিল কিনা সে আমার থেকে তুমিই ভাল জান। এর পরেও তুমি তার মন্দটাই যদি একমাত্র সত্যি বলে ভাবো তাহলে তার আরো দুর্ভাগ্য, তোমারও আরো বেশি অশান্তি। কিন্তু ভাল স্বীকার করার আর ভাল বড় করে তোলার এমনি জোর যে সেটা পারলে এখনো তোমার সব শেষ হয়ে গেল আমি ভাবি না। কোনো কিছুরই শেষ বলে কিছু নেই।

রুচিরা আর কিছু বলেনি। কিন্তু ভিতরটা বিষাক্ত লাগছিল তার। অথচ এই লোকের সঙ্গে তর্ক করারও কেন যেন আর সাহস নেই।

.

রুচিরা মাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল জুন মাসের মাঝামাঝি। এখানেও কংগ্রেস শাসন উৎখাত হয়ে বামজোটের দল ক্ষমতায় এসেছে। তখন

সত্যিকারের আনন্দ হয়েছিল তার। দুমাস বাদে অর্থাৎ আগস্টের মাঝামাঝি কলকাতায় ফিরল। সুস্থির হয়ে দুদিন না কাটতে দাদা-বৌদির মুখে যে সুখবরটা শুনল তাতে রুচিরারও আনন্দে আটখানা হবার কথা। ইন্দ্র ব্যানার্জীর সব দিক থেকেই ভরাডুবি হয়েছে। তার বাড়িঅলা কেসে জিতেছে, কোর্ট-থেকে বকেয়া ভাড়া মিটিয়ে দেবার হুকুম হয়েছে। তার ওপর। বাড়ি ছাড়ার কেস ঝুলছে। এদিকে নতুন সরকার তহবিল তছরুপের অভিযোগে তাকে থানায় টেনে নিয়ে গেছে। আগের সরকারের আমলে চল্লিশ হাজার টাকা সে তার কেমিক্যাল কারখানা সম্প্রসারণের জন্য পেয়েছিল। বলা বাহুল্য, সেটা তখনকার সময়ের। ধরা-করার ব্যাপার। কিন্তু এখন ধরা পড়েছে, সে টাকার এক পয়সাও সেই কারখানায়। যায়নি, কারখানার বাকি অর্ধেকের মালিক সেই টাকাপ্রাপ্তির ব্যাপার স্রেফ অস্বীকার করছে। এবং সেও পার্টনারশিপ বাতিলের ব্যবস্থা পাকা করে এনেছে, কারণ, সেখানেও ইন্দ্র ব্যানার্জীর নামে বহু টাকা ব্যক্তিগত ধার হিসেবে লেখাপড়া করা আছে। তাতে ইন্দ্র ব্যানার্জীর সইও আছে। অনেক তদবির-তদারক করে সে এখন জামিনে খালাস আছে! কিন্তু সুদ-সহ ওই চল্লিশ হাজার টাকা সরকারকে বুঝিয়ে দিতে না পারলে তার জেল অনিবার্য। চল্লিশ হাজার দূরে থাক, চল্লিশ টাকা বার করারও তার মুরোদ নেই এখন।

শুনে সকলে ছেড়ে মা পর্যন্ত খুশী। ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। খুশী রুচিরাও হতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু কোথায় যেন একটা কাটা খচখচ করে বিধছে। শঙ্কর চ্যাটার্জীর সেই হাসি-হাসি মুখ আর ঝকঝকে দুটো চোখ আর তার কথাগুলো চেষ্টা করেও মন থেকে তাড়াতে পারে না। আগেও ওই মুখ ওই চোখ আর ওই সব কথা বার। বার সামনে ভিড় করে এসেছে। কিন্তু রুচিরা আর কিছু ভাবতে চায় না, সে-সব। মন থেকে ঠেলে সরিয়েছে।

এখন আর তাও পারছে না।...শঙ্কর চ্যাটার্জী বলেছিলেন, একটা বছরের মেলামেশার মধ্যে ওর চোখে পড়া মনে ধরার মধ্যে কিছু ছিলই–সেটা মিথ্যে হতে পারে না...বলেছিলেন, তুমি সোনার মেয়ে, সোনা গলিয়ে গয়না করা যায়, আবার ডাণ্ডা বানিয়ে তা দিয়ে ঘা দিলেও আঘাত লাগে, আমি ভাবছি অভিমান-বশে সে-রকম কোনো ভুল হয়ে গেল কিনা।

...তিনি বলতে চেয়েছিলেন, সোনার স্পর্শ দিয়ে তার মন্দটা তুমি দূর করতে পারলে না কেন।

রুচিরা ভাবতে চায় না। কিন্তু ভাবনা আসছেই। আসছেই। তিনি বলেছিলেন, ভালটুকু স্বীকার করার আর ভালটুকু বড় করে তোলার এমনি জোর যে সেটা পারলে এখনো তোমার সবশেষ হয়ে গেল আমি ভাবি না।

...কিন্তু কি শেষ হয়ে গেল ভাবেন না তিনি? রুচিরার তাতে মনের প্রসারতা বাড়বে? আর কিছু না হোক শান্তি আসবে? ওই নির্মম দাম্ভিক লোকের মধ্যে ভাল দেখার মতো কি আছে? কি ছিল?

চকিতে এক অদেখা বিধবা মায়ের মুখ যেন চোখে ভেসে উঠল তার। এর বান্ধবীর সে পিসিমা। যার ছেলেকে হত্যা করার জন্য গাড়িতে তুলে নিয়ে পালিয়েছিল। একটি লোক নিজের প্রাণের ভয়-ডর বিসর্জন দিয়ে বেপরোয়ার মতো সেই দুষ্কৃতকারীদের আড্ডায় হানা দিয়ে অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে সেই বিধবা মায়ের ছেলেকে উদ্ধার করেছে ...জলপাইগুড়ির বন্যায় ত্রাণের সাহায্য করতে গিয়ে নিজের প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে একটি অতি-বৃদ্ধ প্রাণকে জীবনের আলোয় ফিরিয়ে এনেছে। ...অসুখে বস্তির এক গরিব বন্ধুর প্রাণের আশংকা দেখা দিতে ব্যাকুল হয়ে ছুটে এসে বাবাকে প্রায় হুমকি দিয়েই ধরে নিয়ে গেছে চিকিৎসার জন্য। তারপর সেই অসুস্থ বন্ধুর মায়ের হাতে থেকে টাকা গুঁজে দিয়ে আসতে দেখে ফিরে এসে বাবা পর্যন্ত বলেছিলেন, লোকটার দরাজ অন্তঃকরণ সন্দেহ নেই...নিজের বাপের মৃত্যুতে ওই দাপটের লোককে বাচ্চা ছেলের মতো মাটিতে গড়াগড়ি করে কাঁদতে দেখেছে রুচিরা নিজের চোখে।

..শঙ্কর চ্যাটার্জী এ আপনি আমার কি করে দিলেন? এখন আমি কি করব?

দুদিন পরে। গাড়ি করে দিদির বাড়িতেই যাচ্ছিল রুচিরা। ওই বাড়ির গেটের দিকে চোখ পড়তেই বুকের তলায় একটা অদ্ভুত মোচড় দিয়ে উঠল তার। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। পরনে আধময়লা পা-জামা, গায়ে আধময়লা গেঞ্জি। মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। বিবর্ণ মুখ।

রুচিরা দেখল।

সেও দেখছে। ক্রুর খরখরে চাউনি।

গাড়িটা গেট পেরিয়ে যেতেই রুচিরা ড্রাইভারকে বলল, থামো!

গাড়ি থামতে নেমে এল। কাছে এল।

ইন্দ্র ব্যানার্জী এ-রকমটা ভাবেনি। চেয়ে আছে। চোয়াল দুটো এঁটে বসছে।

রুচিরা শান্ত মুখে বলল, আমি দুমাসের ওপর এখানে ছিলাম না। তোমার শরীর তো খুব খারাপ হয়ে গেছে দেখছি।

–তোমার আনন্দ হচ্ছে না?

–না।

–বল কি? কেন?

— কারণ, আমি তোমাকে ভালবেসেছিলাম।

হঠাৎ যেন একটু আশার আলো লাগল ইন্দ্র ব্যানার্জীর বিবর্ণ মুখে। তবু। অবিশ্বাসভরে বলল, এখন? অনুকম্পার দরুন গাড়ি থেকে নেমে এলে?

-না, এখনো তোমার ভালই চাই।

—ভাল চাও? সত্যি তুমি ভাল চাও?

মুখের দিকে পরিষ্কার চেয়ে রুচিরা মাথা নাড়ল। চায়।

চোখে-মুখে আগ্রহ উপচে উঠল ইন্দ্র ব্যানার্জীর।–আমার এখনকার অবস্থা সব শুনেছ তুমি? জানো?

-জানি।

–তাহলে একটু ভিতরে আসবে? দুই-একটা কথা বলার ছিল…শুনবে?

রুচিরা চুপচাপ চেয়ে রইল কয়েক নিমেষ। ওই ব্যাকুল মুখের দিকে চেয়ে বুকের তলায় আবার মোচড় পড়ছে।

বলল, আমি শুনে কি করতে পারি জানি না। আমার এখন যাওয়া সম্ভব নয়, তুমি ইচ্ছে করলে আমার ওখানে আসতে পার। শুনব।

–কবে?

–কাল, পরশু-যেদিন তোমার ইচ্ছে।

আবার গিয়ে গাড়িতে বসল। দিদির ওখানে যেতে আর ইচ্ছে করল না। একটু ঘুরে-টুরে আবার বাড়ি ফিরে এল।

সমস্ত রাত ঘুম হল না রুচিরার। ভেবেছে। শুধু ভেবেছে।

…পরশু নয়, ওই লোক কালই আসবে জানে।

এল।

বাড়ির লোক, দাদা বউদি মা সকলেই বিরক্ত! ওকে দেখা করতে নিষেধ করল। রুচিরা বলল, আমি তাকে আসতে বলেছিলাম।

সকলে অবাক।

রুচিরা এল। ইন্দ্র ব্যানার্জী বসেছিল। উঠে দাঁড়াল।

–বসো।

ইন্দ্র ব্যানার্জী বলল, তুমি বসো।

রুচিরা বসল।–বল।

সোফাটা একটু কাছে টেনে ইন্দ্র ব্যানার্জী বলল, আমি সত্যি বিশ্বাস করব আমাকে তুমি ভালবেসেছিলে?

–কি বলবে বল?

-সব মিলিয়ে পঞ্চাশ হাজার টাকা আমার ভয়ানক দরকার। না পেলে আমার জেল হবেই। আমি জানি এ-টাকাটা তুমি ইচ্ছে করলেই দিতে পার। পার না?

–পারি।

-তুমি আমাকে এবারের মতো বাঁচাও রুচি, আমার আর কোনো পথ খোলা নেই। তুমি অনেক বড়, সব ভুলে এবারের মতো আমাকে রক্ষা কর। তারপর তুমি কি বিচার করবে না করবে জানি না, কিন্তু আমি কথা দিচ্ছি, আমি ভাল হতে চেষ্টা করব, সৎ হতে চেষ্টা করব।

আগ্রহের আতিশয্যে সে উঠে দাঁড়াল। রুচিরা চেয়ে আছে। দেখছে।

চেষ্টা করবে? চেষ্টা?

–রুচি, আমি কি বলতে চাই তুমি বুঝেছ। প্লীজ।

টাকা না দিলে তোমার কত দিনের জেল হবে?

ইন্দ্র ব্যানার্জী থমকাল।–কম করে পাঁচ বছরের। কিন্তু টাকা তুমি দেবে না?

-না। অটল ঠাণ্ডা মুখ রুচিরার।–তুমি যে পুরুষ ছিলে সেই পুরুষ কখনো। দয়া চায় না। দয়া দেখিয়ে কাউকে ফেরানো যায় না। আমি তোমাকে ভালবেসেছিলাম না শুধু, এখনো ভালবাসি। পাঁচটা বছর প্রায়শ্চিত্ত করে যদি এটুকু বুঝতে পার, তাহলে পাঁচটা বছরকে ভয় না করে জঞ্জালমুক্ত হয়ে এস। আমি যাকে ভালবাসি তার ভয় সাজে না। আমার কথায় যদি বিশ্বাস করতে পার, তারপর এস। টাকা পাবে, আমাকেও পাবে।

ইন্দ্র ব্যানার্জী আস্তে আস্তে সোজা হয়ে দাঁড়াল। নির্বাক হতভম্বের মতো চেয়ে। রইল খানিক। তারপর ঝড়ের বেগেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রুচিরা নিষ্পন্দের মতো বসে। স্থির, শান্ত।